দু 'টি ধারা : কিতাবু ল্লাহ ও রিজালু ল্লাহ

মু ফতী মু হাম্মদ তাকী উসমানী দা.বা.

হিদায়াতের মূ ল উৎস কু রআন সু ন্নাহ'র শিক্ষা। এ শিক্ষা অর্জন করতে হবে শিক্ষকের মাধ্যমে। শিক্ষকের মাধ্যম ছাড়া দু নিয়ার কোন শিক্ষা যেমন গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তেমনই কু রআন-সু ন্নাহ'র শিক্ষাও অভিজ্ঞ শিক্ষকের মাধ্যম ছাড়া গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য নয়। বর্তমানে সরলমনা কিছু লোক ব্যক্তিগতভাবে দু -চারটি তাফসীর কিংবা দু -চারটি হাদীসের কিতাব পড়ে আমল শুরু করে দেয় এবং অন্যদেরকেও এ কাজে উৎসাহিত করে। কেউ আবার এ জাতীয় স্বঘোষিত পণ্ডিতকে নিজের ইমাম বানিয়ে নেয়। এদের গোমরাহী প্রায় নিশ্চিত। বিশ্ব বরেণ্য আলেমে দীনের এ লেখাটি উক্ত বিষয়কেই স্পষ্ট করে তু লেছে।–

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد:
فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ... (آل عمران : 164)

দু 'টি ধারা

মানবজাতির সংশোধনের জন্য আল্লাহ তা'আলা দু 'টি ধারা একসঙ্গে দান করেছেন। **এক.** কিতাবু ল্লাহ। কিতাবু ল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসমানী কিতাব। যেমন, তাওরাত, যাবু র, ইঞ্জিল ও সর্বশেষ নাযিলকৃ ত কিতাব কু রআন মাজীদ।

দু ই. রিজালু ল্লাহ। রিজালু ল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমু স সালাম। রিজালু ল্লাহ পাঠানো হয়েছে কিতাবু ল্লাহর ব্যাখ্যা দানের জন্য, যেন তঁ ারা কিতাবু ল্লাহ বাস্তবায়ন করতে পারেন এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের কথা ও কাজের দ্বারা কিতাবু ল্লাহর মর্মার্থ ও উদ্দেশ্য অনু ধাবন করাতে পারেন। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ...

আপনার কাছে আমি যিকর অর্থাৎ কু রআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি লোকদের সামনে তাদের প্রতি নাযিলকৃ ত বিষয়গুলো বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (সূ রা নাহল- ৪৫)

এ প্রসঙ্গে অন্যত্র তিনি বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا...

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মু মিনদের প্রতি অনু গ্রহ করেছেন, যখন তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে প্রেরণ করেছেন এমন একজন নবী যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতসমূ হ তিলাওয়াত করে শোনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের কথা শিক্ষা দেন। (সূ রা আলে ইমরান- ১৬৪)

প্রতীয়মান হলো, আম্বিয়ায়ে কেরাম হলেন মানব জাতির শিক্ষক। প্রত্যেক নবীর আগমনের মূ ল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কিতাব মানু ষদেরকে শেখানো। কেননা শিক্ষকের দিক নির্দেশনা ও ব্যাখ্যাদান ছাড়া আমরা আল্লাহর কিতাব থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখি না।

উস্তাদ ছাড়া শুধু ব্যক্তিগত পড়া-লেখা ফলপ্রসূ হয় না। এটা শুধু কিতাবু ল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; দু নিয়ার প্রতিটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যও এটি এক স্বীকৃ ত নীতি যে, কোন বিষয়ের উপর পারদর্শিতার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে হয় এবং যোগ্য শিক্ষকের শিষ্যত্ব বরণ করতে হয়। এছাড়া কেউ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।

১ম দৃ ষ্টান্ত : কবরস্থান আবাদ হবে

মেডিকেল সায়েন্স বিষয়ে বাজারে বই-পত্রের অভাব নেই। সব ভাষাতেই এ বিষয়ে যথেষ্ট লেখা বাজারে পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি যদি বাজারের এ বইগুলোর সহযোগিতায় কেবল ব্যক্তিগত পড়াশোনার মাধ্যমে ডাক্তার হওয়ার আশা করে তবে তার দ্বারা কবরস্থান তো আবাদ হতে পারে কিন্তু স্বীকৃ ত ডাক্তার হয়ে সু চিকিৎসার আশা তার থেকে কখনোই করা যায় না। কেননা ডাক্তার হওয়ার জন্য স্বীকৃ ত পন্থা সে অবলম্বন করেনি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন শিক্ষক কিংবা গুরুজনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেনি। এ জন্যই বিশ্বের কোন রাষ্ট্র এ ব্যক্তিকে মানু ষের জীবন নিয়ে খেলা করার অনু মতি প্রদান করবে না। সু তরাং প্রকৃ ত ডাক্তার হতে হলে যেমন কোন শিক্ষকের ছাত্রত্ব গ্রহণ করতে হবে তেমনি কিতাবু ল্লাহর শিক্ষালাভের জন্যও রিজালু ল্লাহর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে। কেননা এটা মানু ষের স্বভাবজাত যে, যতক্ষণ না কোন শিক্ষক তাকে শিক্ষাদান করবে কিংবা কোন দীক্ষাগুরু তাকে দীক্ষা দান করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কলাকৌশলের কোন শাখাতেই সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পেঁ ৗছতে পারে না।

মানু ষ ও জন্তুর মাঝে পার্থক্য

মানু ষ ও জন্তু এক নয়। আল্লাহ তা'আলা এদের মাঝে ভিন্নতা দান করেছেন। জন্তুর কোনও শিক্ষক নেই। মানু ষের মত তাদের শিক্ষকের প্রয়োজনও খু ব একটা নেই। যেমন মাছের পোনা ডিম থেকে বের হয়েই সঁ াতার কাটা শুরু করে দেয়; তাকে সঁ াতার শেখাতে হয় না। সৃ ষ্টিগতভাবে এক্ষেত্রে তার শিক্ষকের দরকার হয় না। কিন্তু মানু ষকে সঁ াতার শিখতে হয়। মাছের পোনার মত সে প্রথমেই সঁ াতার কাটতে পারে না। কোনও ব্যক্তি যদি মাছের পোনার মতো নিজের বাচ্চাকে পানিতে ছেড়ে দেয় আর সঁ াতার কাটতে বলে, তাহলে সে মহাবোকা বৈ কিছু নয়। অনু রূপভাবে মু রগির বাচ্চা ডিম থেকে বের হওয়া মাত্র হঁ াটতে পারে। নিজের খাবার নিজে খেতে পারে। পক্ষান্তরে মানু ষের সন্তান এমনটি পারে না। তাকে হঁ াটা শেখাতে হয়। ধীরে ধীরে খাবার খাওয়াতে হয়, শেখাতে হয়।

বোঝা গেল, মানু ষ আর পশু-পাখি এক নয়। পশু-পাখি শিক্ষানির্ভর নয়। কিন্তু মানু ষ সব সময়ই শিক্ষানির্ভর। প্রায় কাজেই তাকে শিখতে হয়। আর শেখার কথা উঠলেই প্রয়োজন হয় একজন শিক্ষকের, একজন মু রুব্বীর যিনি তাকে শেখাবেন; তাকে পরিশুদ্ধ করবেন।

২য় দৃ ষ্টান্ত : বই পড়ে আলমারি বানানো

কারিগরি শিক্ষার বইয়ে টেবিল, চেয়ার, আলমারি ইত্যাদি কীভাবে বানাতে হয় সব কিছু ই লেখা আছে। কী কী

কঁাচামাল লাগবে তাও বিস্তারিত দেয়া আছে। বলুন, এ বইটিকে সামনে রেখে আলমারি বানানো যাবে কি? কখনোই তা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে বইটির আদ্যোপান্ত হয়ত আপনার জানা নেই। তবে একজন মিস্ত্রী আপনাকে হাতে কলমে শিখিয়ে দিয়েছে যে, আলমারি কীভাবে বানাতে হয়। এখন নিশ্চয়ই আপনার দ্বারা আলমারি বানানো সম্ভব হবে।

৩য় দৃষ্টান্ত : বই পড়ে বিরিয়ানি হয় না

রান্না-বান্না শেখার বই। পোলাও, কোরমা, বিরিয়ানি, কাবাবসহ সব ধরনের খাবার তৈরির নিয়ম-পদ্ধতি বইটিতে পাবেন। বইটি হাতে নিয়ে যদি আপনি বিরিয়ানি রান্নায় লেগে যান, নির্দেশনা মত লবণ, মরিচ, মসলা ইত্যাদি ব্যবহার করেন। আমি বলব, আপনার রান্নাকৃত বস্তুটি আর যা হোক সুস্বাদু বিরিয়ানি হবে না। আল্লাহই জানেন, সেটা কী অজানা পদার্থে পরিণত হবে!!

বাস্তব নমুনা মানুষের লাগবেই

মোটকথা, শুধু বই পড়ে মানুষ কোনও বিষয়ে দক্ষ ও পারদর্শী হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। এজন্য মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য একজন উস্তাদ, একজন মুরুব্বী বা একজন দীক্ষাগুরুর প্রয়োজন হয়। দুনিয়ার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। ডাক্তার হতে হলে বিজ্ঞ ডাক্তারের ছাত্রত্ব গ্রহণ করতে হয়। কারিগরি শিক্ষার জন্য দক্ষ কারিগরের শিষ্যত্ব বরণ করতে হয়। সুস্বাদু বিরিয়ানির স্বাদ আস্বাদন করতে হলে দক্ষ পাচকের শাগরেদ বনতে হয়। তেমনই দীন শিখতে হলে একজন উস্তাদ, মুরুব্বী বা মু'আল্লিমের সামনে হঁাটু গেড়ে বসতে হবে। তাদের সোহবত কিংবা জীবনাচার দেখা ছাড়া দীন শেখা আদৌ সম্ভব নয়।

শুধু কিতাব পাঠানো হয়নি

বস্তুতঃ অন্তর্নিহিত এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা কিতাবুল্লাহর পাশাপাশি রিজালুল্লাহ পাঠিয়েছেন। কিতাব এসেছে; তার সঙ্গে কোন নবী বা রাসূল আসেননি এমন একটি উদাহরণও কেউ পেশ করতে পারবে না। হঁ্যা, নবী এসেছেন কিন্তু কিতাব আসেনি, বরং তিনি পূর্ববর্তী কিতাবেরই অনুসরণ করেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত অবশ্যই আছে। কিন্তু নবী ছাড়া কিতাব এসেছে এ জাতীয় কোনও দৃষ্টান্ত নেই। কেন নেই? এর কারণ হলো, যদি শুধু কিতাব পাঠানো হতো, মানুষ এ কিতাব দ্বারা নিজে নিজে আত্মশুদ্ধ হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ খুঁজে পেতো না। শুধু কিতাব থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা মানুষের মাঝে নেই। তাই আল্লাহ নবী ছাড়া শুধু কিতাব পাঠাননি। নবী বিহীন কিতাব পাঠানো তার পক্ষে অসম্ভব ছিল এমন নয়। তাছাড়া মুশরিকরাও প্রায় এরকমই দাবী করেছিল যে,

لو لا نزل عليه القران جملة واحدة

'আমাদের কাছে একবারেই কুরআন পাঠানো হয়নি কেন?'

বস্তুতঃ আল্লাহর জন্য এটা মোটেও কঠিন ছিলো না যে, মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে, তার শিয়রে একটা কিতাব ঝকঝক করছে। আর আল্লাহ আসমান থেকে বলে দেবেন, হে মানবজাতি! এটা তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তোমরা এর শিক্ষার আলোকে চলবে এবং এরই উপর আমল করবে। কিন্তু আল্লাহ এ জাতীয় কিছু করেননি। তিনি শুধু কিতাব পাঠাননি; বরং কিতাবও পাঠিয়েছেন, সঙ্গে শিক্ষকও পাঠিয়েছেন। এমনটি কেন করেছেন?

কিতাব পড়ার জন্য দুই নূরের প্রয়োজনীয়তা

কারণ, আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষার নূর যতক্ষণ না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিতাব বুঝে আসবে না। শুধু কিতাব থাকলে হয় না, বরং কিতাবের লেখাগুলো দেখার জন্য বাইরের আলোর প্রয়োজন হয়। কিন্তু পাঠক যদি অন্ধ হয়, তার চোখে যদি জ্যোতি না থাকে, তাহলে বহিরাগত আলোও কোনও কাজে আসে না। অর্থাৎ কিতাব বোঝার জন্য দুই আলো প্রয়োজন। প্রথমত বাইরের আলো অর্থাৎ বাতি বা সূর্যের আলো। দ্বিতীয়ত নিজের আলো অর্থাৎ চোখের জ্যোতি। এ দু'টির কোনও একটি না থাকলে কিতাব বোঝা তো দূরে থাক পড়াও যাবে না। অনুরূপভাবে হিদায়াত পাওয়ার জন্য শুধু কিতাবুল্লাহ নামক নূর থাকলেই হয় না, বরং রিজালুল্লাহ নামক নূরেরও প্রয়োজন। এ কারণেই কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ নামক দু'টি ধারাই আল্লাহ মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন।

'হাসবুনা কিতাবুল্লাহ'র শ্লোগান

একটি ভ্রান্ত দলের শ্লোগান ছিলো, حسبنا كتاب الله অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবই আমাদের পথ চলার জন্য যথেষ্ট। শ্লোগানটা দৃশ্যত চমৎকার। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যথার্থ শ্লোগান! যেহেতু কুরআন মাজীদেই তো এসেছে, تبيانا لكل شيئ 'কুরআন মাজীদে প্রতিটি বিষয়ের বিবরণ রয়েছে'।

কিন্তু বাস্তবে এ শ্লোগানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অত্যন্ত ভয়াবহ। এদের কাছে প্রশ্ন রাখুন, মেডিকেল সায়েন্সের বই তো তোমার কাছে আছে, যেখানে চিকিৎসার প্রতিটি বিষয়ের বিবরণও আছে। কিন্তু শিক্ষক ছাড়া শুধু বইটি পড়ে কি কেউ ডাক্তার হতে পারবে? অনুরূপভাবে শুধু কিতাবুল্লাহ দ্বারা মানুষ হিদায়াত পেতে পারে না। বরং কিতাবুল্লাহর সঙ্গে প্রয়োজন রিজালুল্লাহ তথা আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা। এটা ছাড়া কিতাবুল্লাহ থেকে ফায়দা গ্রহণ করার কল্পনাও করা যায় না।

মোটকথা, যারা শুধু কিতাবুল্লাহ পেয়েই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষাকে অপাঙক্তেয় মনে করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। কারণ, রিজালুল্লাহকে অস্বীকার করা তো কিতাবুল্লাহকে অস্বীকার করার নামান্তর। কিতাবুল্লাহতেই তো রয়েছে, আম্বিয়ায়ে কেরাম হলেন কিতাবুল্লাহর শিক্ষক। শিক্ষক ছাড়া কিতাবুল্লাহ থেকে ফায়দা নেয়ার সুযোগ কোথায়? কিতাবুল্লাহ মানতে হলে রিজালুল্লাহকে মানতেই হবে। রিজালুল্লাহকে অস্বীকার করা মানে কিতাবুল্লাহকেই অস্বীকার করা। মেডিকেল সায়েন্সের গ্রন্থাদির শুরুতে একটি লেখা সাধারণত সকলের নজর কাড়ে। তা হল, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ সেবন করা নিষেধ। কোন ব্যক্তি যদি এ সতর্কবার্তা ভুলে যায় এবং বই দেখেই সব রোগের চিকিৎসা শুরু করে দেয় তবে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত করা ছাড়া তার আর কিছুই হবে না। অনুরূপভাবে যারা রিজালুল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং শুধু কিতাবুল্লাহকেই যথেষ্ট মনে করে তাদের দ্বারা ভ্রষ্টতার পথ সুগম হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না।

শুধু রিজালও যথেষ্ট নয়

আরেকটি দল রয়েছে, যারা রিজালুল্লাহকেই মনে করে সবকিছু। তারা বলে, আমাদের জন্য রিজালই যথেষ্ট। কিতাবুল্লাহতে কি আছে, তা আমাদের জানার দরকার নেই। এই বলে যেই রিজাল তাদের মনঃপূত হয়, তার কাছে গিয়ে ধর্না দেয়। তাকে নিজেদের নেতা মনে করে পূজা শুরু করে দেয়। এরাও ভ্রান্ত, এরাও পথহারা।

সঠিক পথ

প্রান্তিকতামুক্ত সঠিক পথ হলো, কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহর মাঝে সমন্বয় করা। রিজালুল্লাহর শিক্ষার আলোকে কিতাবুল্লাহর উপর আমল করা। উভয়টার সমন্বয় হলে তবেই হেদায়াত পাওয়া যাবে। এদিকে ইঙ্গিত করে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ما انا عليه واصحابى এখানে ما انا عليه দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কিতাব। আর اصحابى দ্বারা উদ্দেশ্য রিজাল। অর্থাৎ কিতাব, যার উপর আমি আছি তা গ্রহণ করো এবং সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি এ উভয়টির মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে পারবে, সে হেদায়াত পাবে।

দীনের এ সরল পন্থা হতে বিচ্যুত বিভ্রান্ত দলের তৃতীয় আরেকটি শ্রেণী হলো, যারা কিতাবুল্লাহ-রিজালুল্লাহ উভয়টিকেই অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করে। ব্যক্তিগত পড়াশোনার ভিত্তিতে নিজেকে ইমাম আবু হানীফার মত মুজতাহিদ দাবী করে শ্লোগান দিতে থাকে- هم رجال فنحن رجال মূলত তাদের এ দাবী মক্তবের বাচ্চা শিশুর ন্যায় যে কি না هم رجال فنحن رجال এর শ্লোগানে আবেগতাড়িত হয়ে নিজেকে ডাক্তার ভেবে অপারেশনের ছুরি হাতে তুলে নেয়। অথচ এ নির্বোধ এটা বোঝে না যে, দক্ষ ডাক্তার অস্ত্রোপচার করবে স্বীকৃত পন্থায় রোগীর সুস্থতার নিমিত্তে। পক্ষান্তরে তার ছুরি সঞ্চালন রোগীকে মুহূর্তেই পেঁৗছে দেবে মৃত্যুর দুয়ারে।

বর্তমান সময়ে এ শ্লোগানটি বেশ সাড়া ফেলেছে 'অমুক সাহেবের কিতাব পড়ে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে, অনেকেই নামায পড়া শুরু করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি ...'। এই দেওবন্দী মৌলবীরা অকারণেই তার বিরোধিতা করছে। মূলত এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত ঐ অনভিজ্ঞ হাতুড়ে ডাক্তারের মতো, যার চিকিৎসায় ৮/১০ জন মানুষ সুস্থ হলো। এতে তার যশঃ-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এবং লোকেরা তার গুণমুগ্ধ হয়ে লাইন ধরে চিকিৎসা নিতে লাগল। অথচ তাদের জানা নেই যে, কারো হাতে ৮/১০ জন রোগীর আরোগ্য লাভ করা তার ডাক্তার হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কেননা উস্তাদের সান্নিধ্যহীন এ অনভিজ্ঞ হাতুড়ে ডাক্তারের কঁাচা হাতে যে কোন সময়ই ঘটতে পারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

ঠিক তেমনি কিছু মানুষের ধর্ম অভিমুখী হওয়া এটা তথাকথিত কোন 'ডাক্তার' সাহেবের ক্ষেত্রে রিজালুল্লাহ হওয়ার দলীল নয়। কেননা রিজালুল্লাহর দীক্ষা-বঞ্চিত এ ব্যক্তি যে কোনও সময়ই বরবাদ করে দিতে পারে বহু মুসলমানের আখেরাত।

সাহাবায়ে কেরামের দীন শেখার পদ্ধতি

এ দীনের স্বভাব হলো, সূত্র পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে তা বাতি হতে বাতি প্রজ্জ্বলনের ন্যায় সীনা হতে সীনায় স্থানান্তরিত হয়ে আসছে। হযরত সাহাবায়ে কেরাম সুফ্ফায় এভাবেই মিশকাতে নবুওয়াত থেকে দীন শিখেছেন। তাদের সামনে না কোন কিতাব ছিল, না কোন দরস ছিল, আর না কোন নেসাবের সীমাবদ্ধতা ছিল; এমনকি শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রচলিত কোন স্বীকৃতিও তাদের ছিল না। বরং নবীজীর পবিত্র যবান-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ এবং দৈনন্দিনের কর্মকাণ্ড অবলোকনই ছিল তাদের পাঠ্যপুস্তক! দীন শেখার এ পবিত্র ধারা খাইরুল কুরূনের গণ্ডি পেরিয়ে অব্যাহত রয়েছে। আজও নবীজীর হাদীস পাঠকালে বলা হয়... قال فلان এটাই হলো সেই সনদ এবং সূত্র পরম্পরা, যা শত বছরের সময়ের প্রাচীর ডিঙিয়ে আমাদের ঈমানের বন্ধন যুক্ত করেছে নবী কারীম আলাইহিস সালামের সাথে।

দীনের জন্য শিক্ষকের মাধ্যম আবশ্যক

ব্যক্তিগত পড়াশোনা আর কোনও দীক্ষাগুরুর নিকট শিক্ষা নেয়ার মাঝে আসমান ও যমীনের পার্থক্য। কেননা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যে নূর ও বরকত শিক্ষার্থীকে স্নাত করবে এবং ইলমে ইলাহীর যে তাজাল্লী তাতে প্রকাশ পাবে, তা প্রথম পদ্ধতিতে কল্পনাও করা যায় না।

এর কারণ হলো, প্রকৃত দাতা তো আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার সুন্নাত হলো, যখন তিনি দান করেন, তখন একটি মাধ্যমে দান করেন। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ক্ষেত্রেও এ সুন্নাত বহাল ছিল। নবীজীর কাছে ওহী প্রেরণের সময় আল্লাহ তা'আলা জিবরীল আ. কে মাধ্যম বানিয়েছেন। মূসা আ. এর সাথে কথা বলার সময় গাছকে মাধ্যম বানিয়েছেন। তেমনি কিতাবুল্লাহর শিক্ষাদানের জন্য রিজালুল্লাহকে মাধ্যম বানিয়েছেন এবং শিক্ষার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে গুরু-শিক্ষকের শিষ্যত্ব বরণকে অপরিহার্য করেছেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা ঐ জানালার মত, যার মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত সূর্যকিরণ ঘরকে আলোকিত করে তোলে।

আলোচ্য মৌলিক কথাগুলো হৃদয়ে বসাতে পারলে বর্তমানের সব বুদ্ধিপ্রসূত ভ্রষ্ট মতবাদ ও কর্মকাণ্ডের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। যে সকল কোট-টাই পরা ভদ্রলোকেরা কোনও তরবিয়তপ্রাপ্ত স্বীকৃত উস্তাদের শিষ্যত্ব ছাড়াই ব্যক্তিগত পড়াশোনায় নিজেদেরকে ইসলামিক স্কলার হিসেবে পরিচয় দেয় তাদের ছদ্মাবরণ খসে পড়বে ইনশাআল্লাহ।

....

সরল পথ ও... (৯ পৃষ্ঠার পর)

'হে ফিকাহবিদগণ! তোমরা হলে চিকিৎসক, আর আমরা হলাম ঔষধ সরবরাহকারী।' (*দরসে তিরমিযীর* ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

উল্লিখিত বাণীসমূহের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যামানায় একটি দলকে সরল পথের রাহ্বার হওয়ার মর্যাদা দান করবেন। যারা পূর্ববর্তীদের অনুসরণে পরবর্তীদেরকে পথের দিশা দান করার কাজ আঞ্জাম দিবেন। আর পরবর্তীরা তাদের দেখানো পথে চললেই বিপথগামিতা থেকে রক্ষা পাবে ও সরল পথে অবিচল থাকতে পারবে।

রাহবারের দলটি হবে সমকালের আমলদার আলেমগণ। যারা সর্ব-সাধারণের রাহবারীর কাজের পাশাপাশি সীমাতিক্রমকারী, বাতিলপন্থী ও অজ্ঞতার স্বর্গে বাসকারীদের ত্রিমুখী শত্রুতার মোকাবেলায় ঘাম ঝরাবেন।

আর এই রাহবার শ্রেণীর নেতৃত্বে থাকবেন উম্মতের কাণ্ডারী ফিকাহবিদগণ। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি যুগে দীনী ইলমের প্রয়োজনীয় সকল বিভাগে অপেক্ষাকৃত অধিক পারদর্শীদেরকে 'ফিকহ' তথা দীনের সহীহ সমঝ দান করবেন। খোদাপ্রদত্ত সামষ্টিক দক্ষতার কারণে আমলের

ক্ষেত্রে অপর আলেমরাও তাদের দিক-নির্দেশনা গ্রহণে বাধ্য থাকবেন।

সঠিক পথের দিশারী আলেমদের বড় বৈশিষ্ট্য হল, পরমত সহিষ্ণু তা, ফিতনা ফাসাদ থেকে দূ রে থাকা, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকা, বদ-দীনী ও বাতিলের মোকাবিলায় একে অপরের সহযোগিতা করা।

কু রআন-হাদীসের মর্ম অনু ধাবন করতে গিয়ে মু জতাহিদগণের মতপার্থক্য ও সাহাবীগণের আমলের বিভিন্নতার উপর নির্ভরশীল বিরোধপূ র্ণ আমল তাদের নীতিগত ঐক্যে কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃ ষ্টি করে না। নিজের দল ভারী করা আর অন্যের প্রতি ঈর্ষাকাতর হওয়ার মতো হীন মানসিকতা থেকে তারা সর্বদা মু ক্ত থাকে। আল্লাহর দীনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী ও মেহনতকারী পূ র্বসূ রীদের সকলকেই তারা ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। সকলের জন্য সমান দু 'আ করে। ইলম ও আমলের লাইনে যে যতটু কু অবদান রেখেছে ততটু কু র জন্য নিজেদেরকে তাদের কাছে ঋণী মনে করে। মোটকথা, সকলের মূ লনীতি, আদর্শ ও গন্তব্য এক ও অভিন্ন। (চলবে ইনশাআল্লাহ)

লেখক :
নায়েবে মু ফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া। খতীব, জাপান গার্ডেন সিটি জামে মসজিদ।

দিক-নির্দেশনামূলক নিবন্ধ

আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলী

মু ফতী ইবরাহীম হিলাল

আবনায়ে রাহমানিয়ার প্রথম সালানা জলসায় জামি'আ রাহমানিয়ার সাবেক শিক্ষাসচিব ও বর্তমান নায়েবে মু হতামিম সাহেব মাদারেসে দীনীয়ার সম্মানিত শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে যে সারগর্ভ বয়ান পেশ করেছিলেন নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তার অনু লিখন।– সম্পাদক

হামদ ও সালাত এবং আবনায়ে রাহমানিয়ার আগমনে উচ্ছ্বসিত অনু ভূ তি ও অশ্রুসজল অভিব্যক্তি প্রকাশের পর হজরত বলেন,

আমাকে আদর্শ শিক্ষকের গুণাবলীর উপর কিছু কথা পেশ করতে বলা হয়েছে। আমার মু হতারাম আম্মাজান গুরুতর অসু স্থ; হাসপাতালে ভর্তি। তাঁ র সেবা শুশ্রূষা ও এ বিষয়ক পেরেশানীর কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিতাবাদি মু তালাআ করার এবং বিষয়টি বিন্যস্ত করার ফু রসত পাইনি। আল্লাহ রাব্বু ল আলামীন তাঁ র অপার অনু গ্রহে যা কিছু অন্তরে ঢালবেন তা থেকে উপস্থিত কিছু বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

আদর্শ শিক্ষকের পরিচয়

যে শিক্ষক তার নিবিড় অধ্যয়ন, গভীর অধ্যাবসায়, অনন্য পাঠদান, কঠোর নিয়মানু বর্তিতা, সু ন্নাতের অনু সরণ, স্বচ্ছ লেনদেন, আকর্ষণীয় আচরণ ও উন্নত নৈতিকতার গুণে ছাত্রদের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিতে পারেন এবং উক্ত গুণাবলীর ভিত্তিতে তাদের কাছে হয়ে উঠেন আদর্শ, অনু সরণীয় ও অনু করণীয়- এক কথায় এমন ব্যক্তিকেই আদর্শ শিক্ষক বলা যায়। অর্থাৎ যার ইলমী ইনহিমাক ও অধ্যয়ন-একাগ্রতা দেখে ছাত্ররা অধ্যয়ন-মনস্ক হয়ে উঠে, যার পাঠদান ও নিয়মানু বর্তিতা লক্ষ্য করে ছাত্ররা ইলমের বাহক হওয়ার প্রেরণা লাভ করে, যার আমল-আখলাক ও নৈতিকতার মাঝে তারা একজন নায়েবে নবীকে খুঁ জে পায় এবং নিজেরাও স্বতঃস্ফূ র্ত ওরকম হওয়ার চেষ্টা করে এমন শিক্ষক হলেন আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষককে বলে দিতে হবে না যে, ছাত্ররা কোনটা করবে আর কোনটা করবে না। তারা উস্তাদের নকল ও হরকত দেখেই বু ঝতে পারবে তাদের কোনটা করা উচিত আর কোনটা নয়। মূ লত ছাত্ররা অনু করণপ্রিয় হয়। তারা উস্তাদকে দেখে দেখে শিখে। ভালো-মন্দ সবটাই। পক্ষান্তরে উস্তাদ যদি শুধু নসীহত করে যে, এটা করো ওটা করো না, কিন্তু নিজে ওসব নসীহতের ধার ধারে না কিংবা শুধু ছাত্রদেরকে সু ন্নাতের তাগিদ দেয়, নিজে সু ন্নাতের পাবন্দী করে না; ছাত্রদের জামা'আতে নামায আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা করে আর নিজে জামা'আত ছেড়ে দেয়- এমন শিক্ষককে আদর্শ শিক্ষক বলা যায় না। এভাবে ছাত্রও গড়ে উঠে না। এজন্য ছাত্রদের মধ্যে উস্তাদ যেসব গুণ কামনা করে উস্তাদকে প্রথমে সেগুলো নিজের মধ্যে ধারণ করতে হয়। তারপর সেটা ছাত্রদের মধ্যে প্রতিফলিত হতে থাকে। মোটকথা, আদর্শ শিক্ষক হতে হলে সর্বপ্রথম নিজের দায়িত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

দরসের এহতেমাম

ছাত্রদের অনু গত করা ও বশে রাখা একটি গুরুত্বপূ র্ণ বিষয়। এর সবচেয়ে বড় উপায় হল , তাদেরকে কিতাবাদি ভালভাবে বু ঝিয়ে দেয়া। কিতাবাদি আত্মস্থ করিয়ে দেয়া হলে ছাত্ররা অনু গত ও বাধ্য হয়। পক্ষান্তরে পাঠদান যদি দায়সারা গোছের হয় এবং কোনও মতে কেবল দায়িত্ব পালন করা হয়, আর ওয়াজ-নসিহত করা হয় খু ব বেশী, তো এরকম শিক্ষকদেরকে ছাত্ররা অতটা মহব্বত করে না। এরা ছাত্রদের কাছে অতটা শ্রদ্ধার পাত্র হয় না।

এজন্য দরসের এহতেমাম করা চাই। দায়িত্বের সাথে নিয়মিত সবক গ্রহণ, ও সবক প্রদান করা চাই। কিতাবের স্তর, মান, ও দাবী অনু যায়ী পড়াগুলো সু ন্দরতম তারতীব ও বিন্যাসে যদি উপস্থাপন করা হয়, যেন মনে হয় উস্তাদ কথাগুলো তার হৃদয়ের গভীর থেকে বলছেন তাহলে দরসের বাইরেও তিনি ছাত্রদের হৃদয়ে জায়গা করে নিবেন। ছাত্ররা তাকে অনু সরণ করে চলবে এবং তাকে অনু করণের চেষ্টা করবে। পক্ষান্তরে দরসের যথাযথ এহতেমাম নেই, ভালমতো পড়ায় না, বোঝায় না, তো এমন উস্তাদ যদি ছাত্রদের সাথে ভাল আচরণও করে তবু ও ছাত্ররা তাকে দিল থেকে মানতে চায় না বা মানতে পারে না। বলছিলাম, ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করা, ভক্ত ও অনু সারী বানানোর সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হল দরসের এহতেমাম। আর ভালভাবে উপস্থাপন করতে হলে গভীর মু তালাআর বিকল্প নেই। মু তালাআ ভাসা ভাসা হলে ছাত্রদেরকে কীভাবে বোঝাবে? সর্বাত্মক চেষ্টার পরও যদি ছাত্ররা না বু ঝে তাহলে দরসের বাইরে আসরের পর কিংবা রাত দশটার পর বিশেষভাবে মেহনত করতে হবে। প্রধান কিতাবগুলোর জটিল ও গুরুত্বপূ র্ণ অংশগুলো বারবার মু জাকারা করতে হবে। এভাবে মেহনত করলে ছাত্ররা আকর্ষিত হবেই।

নিজেকে দ্বীনী তা'লিমের সাথে সম্পৃ ক্ত করা জরুরী

কিছু ফু যালা এমন আছেন যারা দরস ও তাদরীসের সাথে সম্পৃ ক্ত নয়। ইমামতি ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য কোন পেশায় নিরত আছেন। তাদের ব্যাপারে পরামর্শ হলো, তারা যেন কু রআন সু ন্নাহর সরাসরি খেদমত থেকে একেবারেই বঞ্চিত না থাকেন। এটা সামান্য একটু হিম্মতের ব্যাপার। ইচ্ছা করলেই নিজের ছেলে-মেয়ে, ভাই-ভাতিজা, বোন-ভাতিজীকে সকাল-বিকাল নির্দিষ্ট সময়ে কু রআনে কারীম শেখাতে পারেন। আত্মীয়-স্বজনের পাশাপাশি প্রতিবেশীদের সন্তানাদিকেও এ তা'লীমে শরীক করতে পারেন। এটা অনেক বড় একটা খিদমত। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্ভব হচ্ছে না বলে দরস ও তাদরীস থেকে বিলকু ল বঞ্চিত থাকব এটা হতে পারে না। নিজের অন্যান্য কাজের জন্য যেভাবে সময় বের করেন এর জন্যও সেভাবে একটু সময় বের করবেন। ইয়াকীন রাখু ন, এতে দীনের অনেক ফায়দা হবে। এসব শিক্ষার্থীদেরকে কায়দা, আমপারা ও কু রআনে কারীম শিখাবেন। দু -চারটি করে জরুরী মাসাআলা-মাসাইল শেখাবেন। মাঝে-মধ্যে একটু ওয়াজ-নসিহতও করবেন। এই ক্ষু দে শিক্ষার্থী একদিন

বড় হবে। দুনিয়াবী বিভিন্ন পদ ও পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে। তো এদের অন্তরে যদি কচি বয়সেই কুরআনের বীজ বপন করা যায়, মাসাআলা-মাসাইল অনুযায়ী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করা যায়, তাহলে ভেবে দেখুন, এটা কত বিরাট ব্যাপার হবে ইনশাআল্লাহ।

মোটকথা, যারা সরাসরি দ্বীনের খিদমতে রত নয় তারা প্রথমতঃ কোন মাদরাসায় অন্তত ২/৩ টি সবকের সুযোগ করে নিতে চেষ্টা করবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, দায়িত্ব নিলে সেটা যেন গুরুত্বের সাথেই পালন করা হয়। তা না হলে এর প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়তঃ অনিয়মিত মুদাররিস হওয়ার সুযোগ না পেলে নিজ বাসা বাড়িতে বা মহল্লার মসজিদে কাজে বেরোনোর আগে বা কাজ থেকে ফিরে ২/৩ ঘণ্টা করে কুরআন-হাদীসের দরসের ব্যবস্থা করবে।

লেনদেনে যেন ত্রুটি না থাকে

ছাত্রদের সাথে মু'আমালা ও লেনদেনে যেন কোনও ত্রুটি না থাকে। দেখা যায় ছাত্রদের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছে , দেয়ার নাম নেই। ছাত্রদের দিয়ে নাস্তা আনাচ্ছে টাকা দেয়ার খবর নেই। এটা উস্তাদের বদনামের কারণ। চেষ্টা করবে ছাত্রদের সাথে যেন লেনদেনই না হয়, হলেও দ্রুততম সময়ে তা আদায়ে সচেষ্ট থাকবে। অন্যথায় এভাবে দু'চারদিন হয়ত চলবে তারপর দেখা যাবে এসব ব্যাপারে ছাত্ররা আর সাড়া দিচ্ছে না; অগোচরে সমালোচনা করছে। আপনার খেদমত করতে গিয়ে কোনও ছাত্র আপনার কোনও জিনিস নষ্ট করে ফেলল। জগ, গ্লাস, বরতন ভেঙ্গে ফেলল। আর আপনি এমন রেগে গেলেন যে, ছাত্রটি কিনে দিতে বাধ্য হল। কিংবা বলা হল যে, এটা তাকে কিনে দিতে হবে। এটা উস্তাদের আদর্শ নয়। সে খেদমত করছে এ-ই তো অনেক। তাছাড়া ইচ্ছা করে তো কেউ উস্তাদের জিনিস নষ্ট করে না। এক্ষেত্রে সঠিক আচরণ হল, নষ্ট করা জিনিস যদি ছাত্র কিনেও নিয়ে আসে তাহলে তাকে তার ক্রয়মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া এবং তাকে স্নেহের সাথে বুঝিয়ে দেয়া যে, খেদমত করতে গেলে মাঝে মধ্যে এমন হয়ে যায়, এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সুতরাং জিজ্ঞেস না করে এভাবে তার কিনে আনা উচিত হয়নি। তারপর এই ছাত্রটি যখন শিক্ষক হবে তখন সেও তার ছাত্রদের সাথে অনুরূপ কোমল আচরণ করবে। পক্ষান্তরে খাদেম ছাত্রটিকে যদি নষ্টকৃত জিনিসের ভর্তুকি দিতে হয়, তাহলে শিক্ষক হওয়ার পর সেও এই কারবার করবে। শুধু ছাত্রই নয় সহকর্মী, প্রতিষ্ঠান পরিচালক ও কমিটির সদস্যদের সাথেও লেনদেন স্বচ্ছ রাখতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে লেনদেন করলে যথাসময়ে তা সাফ করতে হবে। কিন্তু ঋণ গ্রহণ করে যথাসময়ে যদি তা পরিশোধে সচেষ্ট না হয়, তাহলে ঘটনা খারাপ দিকে মোড় নিবে। উস্তাদের বদনাম হয়ে যাবে। এজন্য আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় করতে হবে। আয়-ব্যয়ে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। ডাল-ভাতের সামর্থ্য থাকলে ডাল-ভাতই খাবেন; মাছ-গোশতের দরকার নেই। দুনিয়ার যিন্দেগী আর কয় দিনের! আরাম-আয়েশটুকু আখেরাতের জন্য সঞ্চিত রাখুন। ধরুন, আপনার মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকা। তাহলে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজারের মধ্যে সংসারব্যয় নির্বাহের চেষ্টা করুন। আর বাকিটা আপদকালীন সময়ের জন্য জমা রাখুন। কারণ, অসুখ-বিসুখ, বিপদাপদ বলে-কয়ে আসে না। আমার আয় হল পাঁচ হাজার আর ব্যয় করি সাত হাজার তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। আয়ের হিসাব করে তারপর ব্যয় করতে হয়। জীবন কষ্টে-সুখে কেটে যাক কিন্তু ঋণের বোঝা যাতে মাথায় না থাকে। মানুষের কাছে আমার পাওনা থাকতে পারে, আমার কাছে যেন কেউ না পায়। ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে কবরে যাওয়া তো ভালো কথা নয়। মোটকথা, লেনদেন আর আয়-ব্যয়ের বিষয়টি খুব খেয়াল রাখতে হবে। এক্ষেত্রে আপনার আচরণ থেকে ছাত্ররা শিখবে; ভালো-মন্দ সবটাই।

মুআশারাতের প্রতি লক্ষ্য রাখা

চাল-চলন ও আচার ব্যবহার যেন রুক্ষ ও কর্কশ না হয়। ছাত্ররা এসব হজম করতে পারে না। ছাত্রদের সাথে হাসি-খুশি থাকুন। তাদেরকেও সালাম দিন। তারা সালাম দিলে হাসিমুখে উত্তর দিন। হযরত সালাহুদ্দীন সাহেব রহ. (লালবাগ মাদরাসার মরহুম উস্তাদ) কে দেখেছি , ছাত্ররা তাকে সালাম দিলে ওয়ালাইকুমুস সালাম বলে মিষ্টি করে হাসতেন। এতে সালামদাতা ছাত্রটি খুশি হতো। উস্তাদের চলা-ফেরা উঠা-বসা সুন্নাত মোতাবেক হওয়া চাই। আপনার আমল দেখে ছাত্ররা আমল শিখবে। আপনার আখলাক দেখে ছাত্ররা চরিত্রবান হবে।

প্রয়োজনে ছাত্রদের শাস্তি দিতে হলে তারও কিছু নিয়মনীতি আছে। আজকাল তো শাস্তি দেয়াও মুশকিল হয়ে পড়েছে। একই ধরণের অপরাধে যদি বিত্তহীন লোকের ছেলেকে মারধোর করা হয়, আর বিত্তবানের ছেলের প্রতি কঠোরতা না করা হয় তাহলে ছাত্রদের মধ্যে খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। গরীব ছেলেটি ভাববে, হুযুর তাকে এক নজরে দেখলেন আর আমাকে দেখলেন ভিন্ন নজরে। যদি একই ধরনের অপরাধে শাস্তি লঘু করতে হয় কিংবা ছাড় দিতে হয় তবে সবাইকেই ছাড় দিবে। কারও প্রতি শিথিলতা করা হলো আর কারও সাথে কঠোরতা, এটা সাধারণতঃ ভালো চোখে দেখা হয় না। ছাত্রদেরকে মন্দ আখ্যায় সম্বোধন করা উদাহরণতঃ গরু-ছাগল-গাধা বলে তিরস্কার করা বিলকুল ঠিক নয়। এতে ছাত্রদের মধ্যে মন্দ আছর পড়ে। মক্তব, নাজেরা, হিফজখানা ও নীচের জামা'আতের ছাত্রদেরকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করা ভালো। ছাত্রদেরকে তুই তোকারী করা উচিত নয়। এতে তারা মনে মনে ব্যথিত হয়। এসব শব্দ মানুষের কাছে ভারী মনে হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে 'আপনি' এর পরিবর্তে 'তুমি' বলা যেতে পারে। চাই ছাত্রটি দাওরা, ইফতা যে কোনও শ্রেণীরই হোক। অনেক সময় ছাত্রদের পিতৃ নাম বা পিতৃ পেশা উল্লেখ করে ডাকা হয়। যেমন 'অ্যাই অমুকের ছেলে, এদিকে আয়!' কিংবা ঐ জোলারপুত, দালালের পুত ইত্যাদি। কোন তালিবুল ইলমকে এভাবে ডাকা সুস্থরুচির পরিচায়ক নয়। জাত্যাভিমানী কোন কোন ছাত্র তো শুধু এসব কারণেই মাদরাসা ছেড়ে দেয়। আর স্বয়ং উস্তাদই এর কারণ হয়। আল্লাহর পানাহ!

উত্তম চরিত্র-সমুন্নত আখলাক

উত্তম চরিত্র ও উন্নত নৈতিকতা শিক্ষকের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আখলাক-চরিত্রে আঁচড় লাগে এমন সকল বিষয়াদি সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে। নিজের খিদমত নিজে করাই উত্তম ও বাঞ্ছনীয়। একান্ত অপারগতায় খিদমতের জন্য এমন ছাত্রকে নিয়োগ দিবে যাতে অপবাদের কারণ না হয়। খিদমতের জন্য দাড়ি গজিয়েছে এমন ছেলেকে নিয়োগ করুন। শুধু মাত্র সুশ্রী ছাত্রদের দিয়েই খিদমত নিচ্ছেন, কাজের

জন্য কেবল তাদেরকেই ডাকছেন এটা অপবাদের সু যোগ করে দিবে। এ ব্যাপারে খু বই সতর্ক থাকতে হবে। দাড়িবিহীন ছাত্রদের দ্বারা শারীরিক খিদমত (হাত পা দাবানো) নেয়া তো বিলকু ল হারাম। দরস-তাদরীসের ত্রুটি-দু র্বলতা অনেক সময় ছাত্ররা এড়িয়ে যায়, কিন্তু আখলাকের ত্রুটি সহ্য করে না। এটা সহ্য করার মতও নয়। তাছাড়া সব ছাত্রই যে উস্তাদের ভক্ত হবে এমনটা ভাবা ঠিক নয়। কাজেই ত্রুটি তো দূ রের কথা, সামান্য সন্দেহ সৃ ষ্টিকারী কর্মকাণ্ডও পরিহার করবে। মানু ষের চরিত্রের দিকটিই কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড়। এজন্য সতর্ক থাকতে হবে, কেউ যেন আপনার আখলাকী কোন ত্রুটি বের করতে না পারে। সর্বশেষ আরজ করব, 'রাবেতা'র জন্ম হয়েছে আসাতিযায়ে কেরামের সঙ্গে তালিবু ল ইলমীর যামানায় গড়ে ওঠা সু সম্পর্কটি আরো নিবিড়ভাবে ধরে রাখার জন্য। এজন্য আবনায়ে রাহমানিয়াকে অনু রোধ করবো, যে কোনও সমস্যায় আসাতিযায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করে সামনে বাড়ুন। এখন তো মোবাইলের যু গ। যোগাযোগ অনেক সহজ। উদাহরণতঃ আপনি কোন একটা মাসআলা চেষ্টা করেও বু ঝতে পারছেন না। জটিল মনে হচ্ছে। তো আপনি যে উস্তাদের কাছে কিতাবটি পড়েছেন বা রাহমানিয়ায় বর্তমানে কিতাবটি যিনি পাঠদান করছেন, নির্দ্বিধায় তাকে উপযু ক্ত সময়ে ফোন করুন যে, হুযু র কিতাবের অমু ক অংশটি বু ঝে আসছে না। অসময়ে না হলে আমার বিশ্বাস অবশ্যই তিনি এর সমাধান বাতলে দিবেন। নিজে না জানলে অন্যকে জিজ্ঞেস করে হলেও বলে দিবেন। আমাদের কোন উস্তাদই এমন নন যে, আপনাদের সমস্যায় তাঁ রা বিচলিত হবেন না। নিজে না বু ঝে কখনই ছাত্রদেরকে পড়ানো যাবে না। তাছাড়া প্রতিবছরই ছাত্ররা উস্তাদদের তাকরীর নোট করে থাকে। ওগুলো সংগ্রহ করেও আপনারা উপকৃ ত হতে পারেন। দরসে অযথা গল্প গুজব করার দরকার নেই। নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে অত্যন্ত এহতেমামের সাথে কিতাব পড়াবেন। নির্দিষ্ট সময়ের পরও পড়াতে থাকলে ছাত্রদের ওপর মানসিক চাপ পড়ে। এদিকেও সতর্ক দৃ ষ্টি রাখবেন। স্থানীয় হক্কানী উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সু সম্পর্ক বজায় রাখবেন। নিয়মিত না হলেও মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবেন। তাদের মজলিসে উপস্থিত থাকবেন। এতেও অনেক ফায়দা হবে। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে দোজাহানে সহীহ সালামতে রাখু ন। আমীন ॥

সোহবত আবশ্যক (১১ পৃ ষ্ঠার পর)

আল্লাহ রিযিকদাতা, আমি অন্য চাকু রি খুঁ জি। আরও আশ্চর্য যে, অনেকে ব্যাংকে চাকু রি করে, তো এটাকে দাওয়াতের ময়দানে ফলাও করে বলা হচ্ছে, পরিচয় করানো হচ্ছে, ইনি সোনালী ব্যাংকের জি. এম.। সোনালী ব্যাংকের জি. এম. কি কোন ফযীলতের জিনিস? এটা তো দু র্ভাগ্যের বিষয়। দু র্ভাগ্য বশতঃ কেউ ব্যাংকের চাকু রে হলেও তা লু কিয়ে রাখা দরকার। আর তার থেকে বের হয়ে আসার জন্য খু ব চেষ্টা করা দরকার। তাই ব্যাংকে যারা চাকু রীরত আছেন তাদের কর্তব্য হলো, হালাল চাকু রি খুঁ জতে থাকা আর আল্লাহ তা'আলার কাছে কাঁ দতে থাকা। হালাল রুজি পাওয়ার সাথে সাথে এটা ছেড়ে দেয়া।

মোটকথা, যদি আমরা সোহবতকে আবশ্যক করে নেই তাহলে আল্লাহ আমাদের দিলে হিম্মত দান করবেন এবং আমাদের জন্য গুনাহ ছেড়ে দেয়া সহজ হবে। নেক কাজ করাও আসান হবে। আর গুনাহ ছেড়ে দিলে মানু ষ সবচেয়ে বড় আবেদ হয়ে যায়। হাদীসে আছে, اتق المحارم تكن اعبد الناس। হারাম, নাজায়েয, মাকরূহে তাহরীমী ছেড়ে দিলে মানু ষ সবচেয়ে বড় আবেদ হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে গুনাহ ছেড়ে দেয়ার হিম্মত দান করুন। আমীন ॥

অনু লিখন : মাওলানা আব্দু ল হাই
মা'হাদু ল বু হুসিল ইসলামিয়া

বিসমিহী তা'আলা

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ায় শিক্ষা সমাপনকারীদের সমন্বয়ে গঠিত

'রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া'র

বার্ষিক ফুযালা সম্মেলন '১৪

স্থান : জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া মাদরাসা ও মসজিদ কমপ্লেক্স

তারিখ : ১০ মে ২০১৪ খ্রি. রোজ শনিবার সময় : সকাল ৮ টা থেকে আসর পর্যন্ত

সম্মেলনে রাবেতার সকল সদস্যকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

- কেন্দ্রের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও রাবেতার কোনও কোনও সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য ফুযালায়ে কেরামকে পার্শ্ববর্তী/পরিচিত সদস্যদের সঙ্গে যথাসাধ্য যোগাযোগের অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- দূরবর্তী ফুযালায়ে কেরামকে সম্মেলনের আগের দিন চলে আসার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

জামি'আর পক্ষে

মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

মাওলানা হিফজুর রহমান
প্রিন্সিপ্যাল
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

রাবেতার পক্ষে

মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল মাসউদ
আমীর, মজলিসে শূরা
রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়া

সরল পথ ও বাঁ কা পথ

মু ফতী সাঈদ আহমদ

ক. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا...

'এবং তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রশিকে ধরো ও পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না...।' (সূ রা আলে ইমরান- ১০৩)

খ. হযরত জাবের রাযি. এর সূ ত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বসা ছিলাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি রেখা টানলেন ও তার ডানে ও বামে দু টি রেখা টানলেন। অতঃপর মধ্যবর্তী রেখায় হাত রেখে আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا...

যার অর্থ– 'এটা আমার সরল পথ, সু তরাং এর অনু সরণ কর, অন্য কোনও পথ অনু সরণ কর না, অন্যথায় তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে...।' (সূ রা আনআম- ১৫৩)

গ. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সব ক'টি দল জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ জানতে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূ ল! সে দল কোনটি? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে দল আমার আদর্শ ও আমার সাহাবীদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (সু নানে তিরমিযী; হা. ২৬৪১)

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানতে পারলাম:

ক. আল্লাহর আনু গত্যে ঐক্যবদ্ধ থাকা স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ।

খ. এ নির্দেশ সত্ত্বেও উম্মতে মু হাম্মাদী বহু দলে বিভক্ত হবে।

গ. একটিমাত্র দল সরল পথে চলবে আর অন্যরা বাঁ কা পথে হাঁ টবে।

ঘ. বাঁ কা পথের পথিকেরা জাহান্নামের যোগ্য, আর সরল পথের পথিকেরা জান্নাতের সু সংবাদপ্রাপ্ত।

ঙ. সরল পথ হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীদের আদর্শ।

আমরা মহান আল্লাহর দরবারে জান্নাত প্রার্থনা করি। জাহান্নাম থেকে মু ক্তি কামনা করি। এক মু হূ র্তের জন্যও জাহান্নামের আযাব সহ্য করার শক্তি আমাদের নেই। কাজেই জাহান্নামের আশংকা আছে এমন কাজের ধারে কাছেও যেন আমরা না যাই। বাঁ কা পথে হাঁ টার আগ্রহ আমাদের যেন না থাকে। ভু লেও যেন তাতে না হাঁ টি। সরল পথে চলতে সাহায্য চাই স্বয়ং সরল পথের মালিকের কাছে। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সরল পথ দেখিয়ে দিন। সরল পথে চলার তাওফীক দিন। বাঁ কা পথের পরিচয় জানিয়ে দিন। বাঁ কা পথ বর্জনের তওফীক দিন।

সরল পথের পরিচয়

সরল পথের পরিচয়ও সরল। তা হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর কর্মপন্থা। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর কর্মপন্থা বা আদর্শ মূ লত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই আদর্শ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের বিপরীতে অন্য কোনও আদর্শ সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর নেই। ইসলাম যেহেতু ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয় বরং গোটা মানব গোষ্ঠীর জন্য, কাজেই এর বাস্তব নমু নার জন্য একটি বৃ হৎ জামাআতের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা এর জন্য যাদেরকে বাছাই করেছেন, তারাই হলেন জামাআতে সাহাবা। বস্তুতঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ হলো, মৌলিক নীতিমালা। সাহাবাগণের আদর্শ হলো, সে নীতিমালার বিশ্লেষণ, বাস্তবায়ন ও অনু শীলন। একটি অপরটি হতে পৃ থক নয়। বরং এক ও অভিন্ন। সু তরাং সঠিক পথে থাকতে হলে দু 'টিরই অনু সারী হতে হবে। পরিভাষায় যাকে বলে আহলু স সু ন্নাহ ওয়াল জামা'আহ।

সরল পথের বিপরীত হলো বাঁ কা পথ। যেখানে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও সাহাবীগণের আদর্শ উভয়টি অথবা কোনও একটি অনু পস্থিত। সেখানে স্থান করে নিয়েছে অজ্ঞতা, খেয়াল-খু শি ও অন্য কোনও মোহ। এ বাঁ কা পথের অনু সারীকে সংক্ষেপে বলা হয় 'আহলু ল হাওয়া ওয়ায যালালাহ' (প্রবৃ ত্তি ও গোমরাহীর অনু সারী)। এ পথে কেউ হাঁ টে অজ্ঞতার কারণে ও ভু লবশত। আর কেউ হাঁ টে বিশেষ কোনো মোহ নিয়ে ইচ্ছাকৃ ত। প্রথম শ্রেণী অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে মু ক্তি পেলে বা ভু ল ধরিয়ে দিলে সরল পথে ফিরে আসে। দ্বিতীয় শ্রেণী সাধারণত ফিরে আসে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ...

অর্থ : 'তু মি কি তাকে দেখেছো, যে তার খেয়াল খু শিকে নিজ মাবু দ বানিয়ে নিয়েছে এবং জ্ঞান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছেন এবং তার কান ও অন্তর মোহর করে দিয়েছেন আর তার চোখের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন? অতএব, আল্লাহর পর এমন কে আছে, যে তাকে সু পথে নিয়ে আসবে? তবু ও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (সূ রা জাসিয়া- ২৩)

বস্তুত তারা ঐ সকল লোক যাদের জন্য বাহাস-বিতর্ক, মু নাযারা-সামালোচনা কোন কিছু ই উপকারী হয় না। মজার ব্যাপার যে, এদের একটি নিদর্শন হলো, এরা নিজেদেরকে শতভাগ সঠিক মনে করে আর অন্যদেরকে শতভাগ বাতিল মনে করে।

যু গে যু গে সরল পথের দিশারী

ক. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ...

অর্থ : 'আমার মাখলু কের মধ্যে এমন একটি দল আছে যারা মানু ষকে সত্যের পথ দেখায় এবং সেই সত্য অনু যায়ী ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। (সূ রা আ'রাফ- ১৮১)

খ. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সাহায্যপ্রাপ্ত একটি দল সর্বদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিয়ামত অবধি তারা সত্য থেকে বিচ্যু ত হবে না।' (সু নানে তিরমিযী; হা. ২১৯২)

গ. তিনি আরো ইরশাদ করেন, 'ইলমে নববীর ধারক হবে প্রত্যেক প্রজন্মের নেক লোকেরা। যারা ইলমে দীনকে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃ তিসাধন, বাতিল পন্থীদের মিথ্যা দর্শন ও অজ্ঞদের ভু ল বিশ্লেষণ থেকে মু ক্ত রাখবে।' (মিশকাত শরীফ; হা. ২৪৮)

ঘ. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপর এক হাদীসে ইরশাদ করেন, 'আলেমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ মীরাস হিসাবে অর্থ-কড়ি রেখে যান না। বরং রেখে যান ইলম। যে এই ইলম অর্জন করেছে সে পূর্ণ অংশ অর্জন করেছে।' (সুনানে আবু দাউদ; হা. ৩৬৪১)

ঙ. হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আ'মাশ রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ.কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, **(৫ নং পৃষ্ঠায়)**

অর্থ : 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে প্রবেশ করো।' (সূরা বাকারা- ২০৪) নদী বা সাগর পাড়ি দেয়ার সময় যেমন সম্পূর্ণ শরীর নৌকায় থাকতে হয়। শুধু হাত দ্বারা নৌকা ধরে রাখা যথেষ্ট নয়; অন্যথায় স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে তেমনি ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে দাখেল হওয়ার অর্থ হল, করণীয় কাজগুলো করতে হবে, বর্জনীয় কাজগুলো বর্জন করতে হবে এবং হারাম

মাওলা যখন আমার; সব কিছুই আমার। তো করণীয়গুলো সহজ করার জন্য আল্লাহর মুহাব্বত জরুরী। আর মুহাব্বত পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে। আল্লাহ যে আমাদের নিয়ামত দিয়ে ডুবিয়ে রেখেছেন তার জন্যও ফিকির করতে হবে যে, আমি কোন স্তরের মানুষ ছিলাম আর আল্লাহ আমাকে কত উপরে নিয়ে এসেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি চিন্তা করলে দেখবে যে, আল্লাহ তাকে তার

পরিপূর্ণ দীন অর্জনে সোহবত আবশ্যক

মুফতী মনসূরুল হক

بعد الحمد والصلوة قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب. (صحيح البخارى، رقم الحديث ৫২০)

যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, অর্থ : 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নেক লোকদের সাহচর্য অবলম্বন কর।' (সূরা তাওবা- ১১৯) উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ভয় অর্জন করতে বলা হয়েছে আর সেজন্য صادقين অর্থাৎ নেক লোকদের সাহচর্যে থাকতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বড় মেহেরবানী যে, তিনি কোনও কাজের নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে তার কর্মপদ্ধতি বলে দেন। তিনি অন্তরে তাকওয়া অর্জন করতে বলেছেন, আর এজন্য আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সম্ভব হলে প্রতি মাসে, অন্যথায় তিন বা ছয় মাস পরপর হলেও তাদেরকে মুহাব্বত করে তাদের মজলিসে বসার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ এতে অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হবে। আর তখনই পূর্ণ দীন হাসিল হবে। তাকওয়া ছাড়া পূর্ণ দীন অর্জন হতে পরে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ দীন হাসিল করতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

يا ايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة.

ও মাকরূহে তাহরীমী থেকে বেশী সতর্ক থাকতে হবে। এটা নফল ইবাদত অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। হাজারও তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদ, নফল হজ্জ ও উমরা থেকে গুনাহ বর্জন করা বেশী জরুরী। এটাই তাকওয়ার অর্থ। আল্লাহর সত্যিকার ভয় যদি অন্তরে আসে তাহলে কারও দ্বারা গুনাহ হতে পারে না।

আল্লাহর মুহাব্বতের দ্বারা নেক কাজগুলো সহজ হয়। নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি সব ইবাদতেই কষ্ট আছে। তবে আল্লাহর মুহাব্বত থাকলে এই করণীয় কাজগুলো আর কষ্টকর মনে হয় না। যেমন, বিদেশ থেকে আসার সময় উপহার-উপঢৌকনের বড় বড় লাগেজ বহন করার কষ্ট অনুভূত হয় না। কারণ এই কষ্ট মুহাব্বতের মানুষের জন্য করা হয় যে, তারা এগুলো পেলে খুশি হবে, দু'আ দিবে। এজন্য আল্লাহর কাছে তার মুহাব্বত চাইতে বলা হয়েছে–

اللهم انى اسئلك حبك.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার মুহাব্বত চাই। (সুনানে তিরমিযী; হা. ৩৫৫৬) আরেকটা দু'আ হল,

اللهم انى اسئلك منك.

হে আল্লাহ! লোকেরা তোমার কাছে কত কিছু চায়, আমি তোমার কাছে তোমাকে চাই।

আল্লাহকে পেলে আর কী বাকি থাকে! কোন ব্যক্তি সারা দুনিয়া পেল কিন্তু আল্লাহকে পেল না, সে মিসকীন। আরেক লোক কিচ্ছু পায়নি, কিন্তু তার দিলের মধ্যে আল্লাহ আছে; তার কাছে মনে হবে আমি সারা দুনিয়ার মুকুটহীন বাদশাহ।

প্রাপ্য থেকে বেশী মর্যাদা দিয়েছেন।

তো করণীয়গুলো সহজ করার জন্য দু'টি কাজ–

(১) আল্লাহর কাছে দু'আ করা। (২) আল্লাহর নিয়ামতের কথা মাঝে মাঝে একাকিত্বে বসে চিন্তা করা যে, আল্লাহ আমাকে দীনের লাইনে আমার কত বন্ধু-বান্ধব ও ক্লাসফ্রেন্ড থেকে উপরে রেখেছেন।

আল্লাহর ভয়ও বাড়াতে হবে। ভয়ের দ্বারা গুনাহ বর্জন করা সহজ হয়। এর জন্য দু'আ আছে– اللهم انى اسئلك خشيتك.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভয় চাই। (সহীহ ইবনে হিব্বান; হা. ৩০৫) خشية অর্থ মুহাব্বত মিশ্রিত ভয়, যেমনটি আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের হয়ে থাকে। আল্লাহর কাছে ঐ ভয় চাওয়া হচ্ছে। তাহলে গুনাহ বর্জন করা সহজ হবে। শরীয়তে লাখো নফল ইবাদত থেকে গুনাহ বর্জন করা বেশী জরুরী। কারণ শরীয়তের ফর্মুলা হলো, কিছু লাভ হাসিল করা অপেক্ষা ক্ষতি থেকে বাঁচা জরুরী। যেমন, কোন জুসের মধ্যে যদি ভিটামিন থাকে আর তা খেলে ডায়রিয়াও হয় তাহলে তা কেউ খাবে না। মার্কেটেও চলবে না। সুতরাং ইশরাক, চাশত, তাহাজ্জুদ থেকে বেশী জরুরী হলো, গুনাহ বর্জন করা। তবে ওগুলোও ছাড়া যাবে না।

অথচ আজ আমরা নামায, তিলাওয়াত, দান-খয়রাত সব করছি। তাবলীগেও যাচ্ছি। কিন্তু নফস গুনাহের মধ্যে এত মজা পেয়ে গেছে যে, এটা ছাড়তে পারছি না। কোন ফায়দা ছাড়াই গুনাহে

আমরা অভ্যস্ত। বোঝা গেল, দিলের মধ্যে তাকওয়া আসেনি। টাখনু র নীচে পু রুষের পায়জামা, প্যান্ট, লু ঙ্গি ইত্যাদি পরা কবীরা গুনাহ। কিন্তু এই গুনাহে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, হাদীস শোনার পরেও আমরা তা থেকে বিরত থাকতে পারছি না। হাদীসে আছে, টাখনু র নীচে যারা পায়জামা, প্যান্ট, লু ঙ্গি পরবে আল্লাহ তাদের উপর এত রাগান্বিত হবেন যে, হাশরের ময়দানে তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পাক করবেন না। لاينظر الله اليهم ولايزكيهم (সু নানে তিরমিযী; হা. ১২২৯) ইংরেজরা এই লেবাস আমাদের কঁ াধে চাপিয়ে দিয়ে গেছে। পু রুষের জন্য টাখনু র নীচে একমাত্র মোজা ছাড়া অন্য কোন লেবাস পরা কঠিন হারাম।

মদীনা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের দেশ থেকে যারা ডিগ্রি আনতে গেছে তাদেরকে গত উমরার সফরে আমি সোহবতের কথা বলে এসেছি। বলেছি, বাংলাদেশ থেকে কোনও বড় আলেম আসলে তোমরা তার সোহবতে বসবে। অন্যথায় তোমরা আহলে হাদীস হয়ে গোমরাহ হয়ে যাবে। বর্তমানের একটা গোমরাহ ফেরকার নাম আহলু ল হাদীস। নাম সু ন্দর। কাজ গলত। মূ লত এটা কোন ফেরকার নাম নয়। যে ব্যক্তি লক্ষ লক্ষ হাদীস জানে তাকে আহলে হাদীস বলা হয়। যেমন ইমাম বু খারী রহ. ছিলেন আহলু ল হাদীস। অথচ আমাদের বংশালে দর্জি, সু ইপার, রিক্সাওয়ালা, সবাই আহলু ল হাদীস। যাদের অবস্থা হল, একটা হাদীসও আরবীতে পড়তে পারে না।

সেখানে (মদীনায়) লোকদের মধ্যে মানার যোগ্যতা দেখলাম। একবার রওযায় সালাম পেশ করতে গিয়ে এক ব্যক্তিকে ছবি তু লতে দেখে আমরা তাকে নিষেধ করলাম। আমরা বু খারী শরীফের হাদীস ان اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون (যারা প্রাণীর ছবি তোলে বা অঙ্কন করে, তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কঠিনতম শাস্তির সম্মু খীন হবে। (সহীহ বু খারী; হা. ৫৯৫০) পেশ করলাম। সাথে সাথে সে ক্যামেরা বন্ধ করে দিল। এটা একটা ভাল যোগ্যতা। কু রআন-হাদীস সামনে আসার পর কোন তর্ক না করা। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টাখনু র নীচে লেবাস পরতে নিষেধ করেছেন, এটাই যথেষ্ট। রাসূ লের মু হাব্বত বেশী হলে হয় প্যান্ট পরাই ছেড়ে দিবে, না হয় প্যান্ট সব কেটে টাখনু র উপর করবে। অন্যথায় বোঝা যাবে ইংরেজদের মু হাব্বত বেশী। নাঊযু বিল্লাহ।

আরেকটা গুনাহ হলো, দাড়িতে ক্ষু র বা ব্লেড চালানো। এটা এমন একটা গুনাহ যাতে কোন মজা নেই। প্রতিদিন সময় নষ্ট, পয়সা নষ্ট। আর ব্লেড তো মু খে না, বরং রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজায় চালাচ্ছি। অথচ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু হাব্বতের দাবী হল, আমার চেহারা তার চেহারার মত হবে। কবি বলেন,

تعصى الرسول وانت تظهر حبه
ان هذا فى الفعال بديع،
لو كان حبك صادقا لأطعته
فان المحب لمن يحب مطيع.

রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচ্ছেন আমার উম্মতের চেহারায় যেন দাড়ি থাকে। আর ঐ দাড়ি দেখে যেন উম্মতকে চিনে হাউজে কাউসার থেকে পান করাতে পারি। তার জন্য শাফাআত করতে পারি। দাড়ি রাখার জন্য অন্যকে দাওয়াত দিলে ইনশাআল্লাহ দাড়ি রাখার হিম্মত হয়ে যাবে। দাড়ি মু ণ্ডানো হারাম। এক মু ষ্টি থেকে ছোট করাও হারাম। দাড়ি রাখা ওয়াজিব। সু তরাং আমরা আমাদের চেহারা নবীর চেহারার মত বানাই। কষ্ট হবে না; শুধু ছেড়ে দিলেই হল।

টেলিভিশনের গুনাহেও আমরা লিপ্ত। আমরা দীনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় কত সময় ব্যয় করছি অথচ আমাদের ঘরে টেলিভিশন। এটা দীন বিলু প্তকারী জিনিস। টেলিভিশন ঘরে ঢু কলে দীন সালাম করে চলে যায়। কারণ ঐ ঘরে এখন ২৪ ঘন্টা ইয়াহুদীদের দাওয়াত। নাচ-গান, যিনা-ব্যভিচার, অশ্লীলতা-বেহায়াপনার দাওয়াত। এত নগ্নতা একজন মু সলমান কীভাবে দেখতে পারে! সাপে কামড় দিলে নাকি ঝাল জিনিস মিষ্টি লাগে। তো আমাদেরকে ইবলিস কামড় দিয়েছে। আশ্চর্য! বর্তমান সমাজে দীনদার বলতে টিভিওয়ালা লোকদেরকে বোঝানো হয়। অথচ এটা যে ঘরে থাকে ২৪ ঘন্টা সে ঘরে খোদার গযব নাযিল হয়। টেলিভিশন না থাকার কারণে বিবি-বাচ্চা রাগ করে চলে যায়, যাক! কারণ বিবি-বাচ্চার বিকল্প আছে। কিন্তু আল্লাহ রাগ করলে তার কোনও বিকল্প নেই। সু তরাং ঘরে টেলিভিশন থাকলে ঘরওয়ালাদেরকে বু ঝিয়ে যত দ্রুত সম্ভব তা বের করে দিতে হবে। সাথে সাথে ঘরে টেলিভিশনের ক্ষতির তা'লীম করতে হবে।

আমরা ঈমানের লাইনে মেহনত করছি। কিন্তু ছেলেকে মাদরাসায় দেয়ার সাহস হয় না। মানু ষকে ঈমানের কথা বোঝাতে গিয়ে বলি, আল্লাহ থেকেই সবকিছু হয়, আল্লাহই রিযিকদাতা। কিন্তু আমার ছেলেকে মাদরাসায় দেই না এই ভয়ে যে, ছেলে কী খাবে? 'আল্লাহ রিযিকদাতা' দিলে এ কথা ফিট করতে পারি না। অনেকে বলে ছেলেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার না বানালে সে চলবে কী করে? ভিক্ষা করবে? অথচ কোন আলেমকে কোনও দিন কেউ ভিক্ষা করতে দেখেছে? যদি কোন আলেম অর্থ-কড়ি কিংবা সাহায্যের কথা বলে থাকে তাহলে দীনী প্রতিষ্ঠানের জন্য বলেছে, আল্লাহর জন্য বলেছে। এটাকে চঁ াদা বলে; ভিক্ষা নয়। দীনের জন্য স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চঁ াদা সংগ্রহ করেছেন।

এমনিভাবে যদি কোন ঈমানের মেহনতকারী দীনদার ব্যক্তিকে বলা হয়, একজন ভালো আলেম পাওয়া গেছে, আপনার মেয়েকে তার কাছে বিবাহ দিতে পারেন। সে বলে, আলেমের কাছে মেয়ে দেবো! আমার মেয়ে খাবে কী? ঐ আলেম কত টাকা ইনকাম করে? আরে! আপনার মেয়েকে ঐ আলেম খাওয়াবে নাকি আল্লাহ তা'আলা খাওয়াবে? যে আল্লাহ ঐ আলেমকে খাওয়াবে সেই আল্লাহ আপনার মেয়েকেও খাওয়াবে। তাহলে চিন্তা করি, আমি ঈমানের কী মেহনত করলাম! বরং এমন ঘটনাও আছে যে, মহল্লার আমীর তার কর্মচারীর ছেলেকে মাদরাসায় দিতে বাধা দেয়। বলে, আগে স্কু লে পড়াও। বোঝা গেল, ঈমান ইয়াকীনের বয়ান আমাদের যবানে; কলবে পৌঁ ছে নাই। সাহাবায়ে কেরাম রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে থেকে মেহনত করে ঈমান হাসিল করেছিলেন। তাই কোন হক্কানী নায়েবে নবীর সোহবতে থেকে ঈমানী মেহনত করতে হবে। তাহলে মু খের ঈমান কলবে আসবে। সোহবত ছাড়া আলেমের ইলমও কলবে যায় না। আলেমরা যত ইলমই অর্জন করুক, যদি সে কারও

সোহবতে গিয়ে ইলমকে কলবে হাসিল না করে তাহলে ঐ ইলমের চার পয়সার দাম নেই। এ রকম ইলম ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, শীয়াদের কাছেও আছে। সু তরাং সোহবত সবার জন্য জরুরী। একজন স্কু লের ছাত্র সোহবতে গেলে কামিয়াব হয়ে যাবে। আর একজন মাদরাসার ছাত্র আল্লাহ ওয়ালার সোহবতে না থাকলে কামিয়াব হবে না। ইসলামের ভিত্তিই হলো এই সোহবত। সাহাবায়ে কেরাম সোহবতের দ্বারাই সাহাবী হয়েছেন। আর কেয়ামত পর্যন্ত দীন এই সোহবতের মাধ্যমেই আসবে। ইন্টারনেট বা অন্য কিছু র মাধ্যমে নয়। তাই কোন আল্লাহওয়ালাকে নিজের মু রুব্বী বানিয়ে তার কাছে অন্তরের রোগ পেশ করতে হবে এবং তার হেদায়াত মত নফসের সাথে মু জাহাদা করে আমল করতে হবে। এটা বড় জিহাদ। তখন ঐ ব্যক্তির অন্তরের গুণ হাসিল হবে। আর যদি কোন ব্যক্তির সোহবত দ্বারা কিছু হাসিল নাও হয় তাহলে এই সু ন্নাতের উপরে আমল করার কারণে তার নিশ্চিতভাবে ঈমানী মৃ তু ্য নসীব হবে।

আমরা অনেকে ব্যাংকে চাকু রি করি; ইন্সু ্যরেন্স করি। এসব হারাম। বাংলাদেশে কোন ইসলামী ব্যাংক এখনও প্রতিষ্ঠা হয়নি। এখানে কেন বলি না, **(৮ নং পৃ ষ্ঠায়)**

পঞ্চম খলীফা হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. এর বৈপ্লবিক জীবন

মাওলানা আব্দুল মালেক

জন্ম

যেসব মহামনীষীগণ দুনিয়ার সর্বোচ্চ ভোগবিলাসের সুযোগ পেয়েও সাদাসিধে জীবন অবলম্বন করেছেন এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য নিজেদের জান-মাল কুরবানী করে দিয়েছেন তাদের অন্যতম হলেন হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মারওয়ানের পৌত্র আর তার মাতা উম্মু আসেম ছিলেন হযরত উমর ফারুক রাযি. এর পৌত্রী (উম্মু আসেম বিনতে আসেম ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব)। জীবনের বড় অংশ তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। পিতা আব্দুল আযীয তাকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য মিসর হতে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। পিতার মৃত্যু (৮৫ হি./৭০৪ খ্রি.) পর্যন্ত তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন। অতঃপর তার চাচা খলীফা আব্দুল মালিক তাকে দিমাশকে নিয়ে যান এবং স্বীয় কন্যা ফাতিমার সাথে তার বিবাহ দেন।

হিজাজের গভর্নর

রবিউল আউয়াল ৮৬ হি. মোতাবেক ফেব্রুয়ারী ৭০৫ খ্রি. খলীফা ১ম ওয়ালীদ তাকে হিজাজের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি এই শর্তে এতে যোগদান করতে সম্মত হন যে, তিনি পূর্বের গভর্নরের মত জনগণের উপর জুলুম অত্যাচার করে রাজকোষ ভরতে পারবেন না। খলীফা ওয়ালীদ এই শর্ত মেনে নেন এবং বলেন, রাজকোষে এক পয়সা না এলেও আপনার উপর কোন আপত্তি থাকবে না। গভর্নর নিযুক্ত হয়েই তিনি মদীনার দশজন হাদীস বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি মজলিসে শূরা গঠন করেন এবং তাদের পরামর্শক্রমেই রাষ্ট্রীয় কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন। ফলে ন্যায়-ইনসাফের ও ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচারের ব্যাপক উন্নতি সাধন হওয়ার পাশাপাশি জনহিতকর যাবতীয় ক্ষেত্রেও ঈর্ষণীয় উন্নতি সাধন হয়।

মধ্যবর্তী সময়

মদীনা হতে দিমাশকে চলে আসার পর দীর্ঘ ছয় বছর তিনি কীভাবে ও কী কাজে সময় অতিবাহিত করেন ঐতিহাসিকগণ তা উল্লেখ করেননি। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. শুধু এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, অতঃপর তিনি দিমাশকে তার চাচাতো ভাইয়ের কাছে চলে আসেন।

তবে বিভিন্ন ঘটনা হতে জানা যায় যে, খলীফা ওয়ালীদ ও সুলাইমান শাসনকার্য সংক্রান্ত বিষয়ে ও বিশেষ পরিস্থিতিতে তার সাথে পরামর্শ করতেন।

খলীফাতুল মুসলিমীন

খলীফা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালেক ৯৯ হি./৭১৭ খ্রি. অক্টোবর মাসে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রখ্যাত আলেম, ফকীহ ও উযীরে আযম রাযা ইবনে হাইওয়াহ রহ. এর পরামর্শে চাচাতো ভাই উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. কে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। খলীফা সুলাইমান এই অসুখেই মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর উমর ইবনে আব্দুল আযীয বাইয়াত গ্রহণের পূর্বে জনসমাবেশে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, হে জনমণ্ডলী! আমার উপর খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করে আমাকে কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এর জন্য আমার সাথে পূর্বে আলাপও করা হয়নি এবং মুসলিম জনগণের মত বা পরামর্শও গ্রহণ করা হয়নি। অতএব তোমরা নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দমত কাউকে খলীফা নির্বাচন করে নাও। এ কথা শুনে উপস্থিত জনতা একবাক্যে বলে উঠল, আমরা আপনাকেই খলীফারূপে গ্রহণ করলাম এবং আমরা আপনাকেই পছন্দ করি।

খেলাফত লাভের পর

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. হুকুমতের লাগাম হাতে নেয়ার সাথে সাথে সেই সব আমলাকে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন যারা অত্যন্ত জালেম ছিল এবং যাদের অন্তরে আল্লাহর কোনও ভয় ছিল না। সিংহাসনে আরোহনকালে তার সামনে শাহী জাকজমকপূর্ণ যেসব মূল্যবান বস্তু উপঢৌকন হিসেবে পেশ করা হয়েছিল তিনি দ্রুত সেগুলো বাইতুল মালে পাঠিয়ে দেন। খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর থেকেই তার আচার-আচরণ ও জীবনধারা একদম পাল্টে যায়। মনে হচ্ছিল তিনি খলীফা সুলাইমানের স্থলাভিষিক্ত নন বরং তিনি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এর স্থলাভিষিক্ত। গভীর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তিনি রাজপ্রাসাদের দাসী বাদীদেরকে তাদের নিজ নিজ খান্দান ও শহরগুলোতে পাঠিয়ে দেন। তিনি স্বীয় মজলিসকে- যা ইরানের শাহানশাহ ও রোম সম্রাটের দরবারে রূপ নিয়েছিল- খেলাফতে রাশেদার আদলে সাদাসিধে ও সুন্নাহ মুতাবিক ঢেলে সাজান। তিনি তার জায়গীরসমূহ মুসলমানদের ফিরিয়ে দেন। এমনকি স্ত্রীর গহনাপত্রও বাইতুল মালে জমা দিয়ে দেন। তিনি এমন কৃচ্ছ্র জীবন ইখতিয়ার করেন যার নজির বাদশাহদের মধ্যে দূরের কথা ফকীর দরবেশদের মধ্যেও মেলা ভার। তিনি তার পোশাক-আশাকের সংখ্যা এমনভাবে কমিয়ে দিয়েছিলেন যে, তার ছিল মাত্র একটি জামা। সেটি শুকানোর অপেক্ষায় থাকায় জুমু 'আর জামা'আতে শরীক হতে তার কখনও কখনও বিলম্ব হয়ে যেত। তার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির পরিমাণ এই দাঁড়িয়েছিল যে, হজ্জ করার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা সমাধা করার মত অর্থ-সম্পদ তার নিকট ছিল না। দৈনিক খোরাকী খরচ ছিল মাত্র দুই দিরহাম।

সতর্কতার অবস্থা এমন ছিল যে, যদি সরকারি বাতি জ্বলত এবং সে অবস্থায় কেউ তার ব্যক্তিগত কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে থাকত অথবা কোন ব্যক্তিগত কথাবার্তা বা আলোচনা শুরু হয়ে যেত তৎক্ষণাৎ তিনি বাতি নিভিয়ে দিতেন এবং আলোর জন্য ব্যক্তিগত বাতি চেয়ে নিতেন।

তার এই সতর্কতা শুধু তার ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি তার হুকুমতের আমলাদেরকেও সব ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের শিক্ষা দিতেন। মদীনার শাসনকর্তা আবু বকর ইবনে হাযম সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিকের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন যেন পূর্ব নিয়ম মাফিক তাকে সরকারী মোমবাতি বা বাতি

সরবরাহ করা হয়। সু লাইমানের ইন্তিকালের পর এই চিঠি উমর ইবনে আব্দু ল আযীয রহ. এর হাতে পড়ে। তিনি উত্তরে লিখেন, 'আবু বকর! আমার স্মরণ আছে, এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূ র্বে শীতের অন্ধকারেও তু মি মোমবাতি বা অন্য কোন বাতি ছাড়াই পথে বের হতে। **(১৯ নং**

কথা শোনার জন্য বিশেষ মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে শুনতে হতো। তিনি বলতেন, আমার ভয় হয়, আমার অজ্ঞাতসারে আমার গলার স্বর উঁ চু না হয়ে যায়।

এ হতে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, আদবই হলো সবচেয়ে বড় জিনিস। আর প্রকৃ তপক্ষে আদব

পরিণত হয়ে গেল কালামু ল্লাহর কারণে। প্রকৃ তপক্ষে এসব দ্বারা আল্লাহর কালামের আদব শিখানো হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে যেসব জিনিসের সম্পর্ক এর সাথে রয়েছে সেসব জিনিসের সম্মান ও আদব ওয়াজিব করা হয়েছে। কালামের কারণে অক্ষরগুলি, অক্ষরের কারণে কাগজ, কভার ও বোর্ড

ব ড় দে র লে খা

শা'আইরুল্লাহর প্রতি আদব

হাকীমু ল ইসলাম কারী মু হাম্মদ তৈয়ব রহ.

পৃ ষ্ঠায়)

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد -

বু যু র্গানে মু হতারাম,

দীনের জন্য আদব একটি মৌলিক জিনিস। আদব যে পরিমাণে বৃ দ্ধি পাবে, সে অনু পাতে মানু ষের দীনদারী বা ধর্মপরায়ণতাও বৃ দ্ধি পাবে। এবং যে পরিমাণ বেআদবী, গোস্তাখী, দু ঃসাহস, পাপকর্মের প্রতি নির্ভীক ও নির্ভয় হতে থাকবে, মানু ষ দীন হতে সে পরিমাণ দূ র ও সম্পর্কহীন হতে থাকবে। ইলম, আমল ইত্যাদি সব বিষয়ে শরীয়ত আদবের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। যেমন– কু রআনে মাজীদে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ...

'হে ঈমানদারগণ! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মজলিসে বসে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বল না। নিজেদের আওয়াজ বা স্বরকে নীচু ও ক্ষীণ রেখো। তোমাদের স্বর এমন যেন না হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বর হতে উঁ চু হয়ে যায়। তাহলে এর ফল দাঁ ড়াবে এই, তোমাদের সকল আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা আমলের প্রতিদানে কোনরূপ সওয়াব ও প্রতিদান পাবে না।' (সূ রা হুজু রাত- ২)

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত উমর রাযি. এর কণ্ঠস্বর জন্মগতভাবে বু লন্দ ও উচ্চ ছিল। তার আওয়াজই এমন ছিল যে, নীচু স্বরে কথা বললেও মনে হতো তিনি উঁ চু স্বরে কথা বলছেন। কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তার আওয়াজ এত ক্ষীণ ও নীচু হয়ে গিয়েছিল যে, কোনও কোনও সময় তার হলো আল্লাহ তা'আলার প্রাপ্য। মহান সত্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। এজন্যই তার দরবারে আদব, বিনয়, ও নম্রতার প্রয়োজন। তারপর যেসব বু যু র্গানের নিসবত ও সম্পর্ক স্থাপিত আল্লাহ পাকের সাথে, তাদেরকেও আদব, সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে। যেমন, কু রআন মাজীদের আদব নির্ধারণকরত বলা হয়েছে,

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

'নাপাক অবস্থায় মানু ষ কু রআন পাক স্পর্শ করবে না।' অপবিত্রতার ব্যাপার যদি জানাবত পর্যন্ত পেঁ ৗছে যায় তবে মৌখিক তিলাওয়াতও জায়েয নয়। ধরা হয়, যেন জিহ্বাও অপবিত্র হয়ে গেছে। এসব হলো কু রআন মাজীদের আদব, যা শিখানো হয়েছে। এজন্য যে, এ কালামের নিসবত ও সম্পর্ক রয়েছে আল্লাহ তা'আলার সাথে। যাকে 'কালামু ল্লাহ' বলা হয়। আল্লাহ তা'আলাকে আদব-সম্মান করা যখন জরুরী ও আবশ্যক তখন তার কালামকেও সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে, আদব করতে হবে এবং করা অত্যন্ত জরুরী। অথচ যে কু রআন মাজীদ আমাদের নিকট রয়েছে তা কাগজে লিখিত অক্ষরসমূ হের সমষ্টি। যা দ্বারা কালামু ল্লাহ লিখে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ হলো কালামের চিহ্ন ও নিদর্শন। কালাম বলা হয় অর্থবোধক শব্দকে। যা দ্বারা আমরা মনের ভাব ব্যক্ত করে থাকি। এসব অক্ষর ও চিত্র যে কাগজে লিখা হয়েছে, সে কাগজও বিনা উযূ তে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। ঐ জাতীয় কাগজগুলোকে আঠা দিয়ে বাঁ ধাই করে কালামু ল্লাহকে হিফাযত ও সংরক্ষণ করা হয়। সে লিখিত কাগজ বাঁ ধাই করার বোর্ডও সম্মানের পাত্রে সবই স্তরবিশেষে সম্মানের পাত্র হয়েছে। সম্মান প্রদর্শনকে জরুরী করা হয়েছে। এসব জিনিসের কোনও একটির সাথে সামান্যতম বেআদবী ও গোস্তাখীতে সকল আমল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেহেতু বেআদবী ও গোস্তাখীর সাথে দীন কায়েম থাকতে পারে না।

এভাবে যেমন আল্লাহ তা'আলার আদব করা ওয়াজিব, তদ্রূপ আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফের আদব করাও ওয়াজিব করা হয়েছে। 'আল্লাহর ঘর' এ সম্পর্কটি যখন এসে গেছে তখন আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা অবশ্য করণীয় হয়ে পড়েছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্থান, কাল ও পাত্র হতে সম্পূ র্ণ পাক-পবিত্র। কিন্তু সম্পর্ক তখনই হয়, যখন তা আল্লাহর তাজাল্লির কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন এ ঘরেরও সম্মান করা জরুরী হয়ে পড়ে। বায়তু ল্লাহ শরীফের আদব করা, সম্মান প্রদর্শন করা যখন ওয়াজিব হলো, তখন বায়তু ল্লাহ শরীফ যে মসজিদে হারামে অবস্থিত, সে মসজিদের আদব ও সম্মান ওয়াজিব হয়ে গেল এবং এ পরিমাণ বরকতময় ও বরকতপূ র্ণ হয়ে গেল যে, সেখানে যদি এক রাকাআত নামায আদায় করা হয় তবে এক লাখ রাকাআত নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। এ হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে নিসবত বা সম্পর্কের বরকত।

মসজিদে হারাম যে স্থানে অবস্থিত সে স্থানের নাম হলো মক্কা মু কাররমা। মসজিদে হারামের কারণে মক্কা মু কাররমাও পরম সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হলো। তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, শ্রদ্ধা করা জরুরী হয়ে পড়ল। আর মক্কা মু কাররমা হলো হিজায প্রদেশের অংশবিশেষ। এ

হিসেবে হিজায এবং সম্পূর্ণ আরবভূমি সম্মানের পাত্র হয়ে গেল।

মোটকথা, স্তর হিসেবে সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। কোন একটির প্রতিও যদি বেআদবী ও গোস্তাখী করা হয়, তবে দীন ঠিক থাকা সুকঠিন হয়ে পড়বে।

এ জন্যই এসব ব্যাপারে শিষ্টাচার এবং শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান প্রদর্শনকে অবশ্য কর্তব্য বলা হয়েছে। হাদীসে আছে,

من لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا.

যে ব্যক্তি কনিষ্ঠদের প্রতি দয়া ও মেহেরবানী করবে না এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করবে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এখানে বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে ওয়াজিব করা হয়েছে এবং সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যদি পালন করা না হয়, তবে আমাদের জামাআতের মধ্যে গণ্য করা হবে না। বয়োবৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি ইলমও বিদ্যমান থাকে, তবে ইলমের কারণে পৃথকভাবে সম্মান করতে হবে। ইলমের সাথে যদি যুহদ ও কানা'আত, দুনিয়া বিমুখতা ও অল্পেতুষ্টির গুণ থাকে, উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতা থাকে, তবে এসবের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হবে। আর যদি কোন প্রকার কামাল ও মহৎ গুণ না থাকে তবে শুধু মাত্র বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনকে ওয়াজিব করা হয়েছে।

বয়স তো আল্লাহ তা'আলার দানকৃত। মানুষের ইচ্ছাধীন কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বলা হয়েছে, এ সবের আদব ও সম্মান কর।

ফল দাঁড়াল এই যে, কোনও প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের যোগ্যতা তা প্রাকৃতিক হোক অথবা শরীয়ত নির্দেশিত হোক, ইচ্ছাধীন হোক অথবা ইচ্ছা বহির্ভূত হোক যদি তার মূল্যায়ন করা না হয়, তবে বলা হয়েছে, হয়ত তোমাদের দীন ও আমল আক্রান্ত হবে।

নিসবত বা আত্মীয়তার আদব

ওলী-দরবেশগণ নিসবতের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল থাকেন। স্বীয় শাইখ, শাইখের সন্তান-সন্ততি ও আবাসভূমিকেও তারা নিসবতের কারণে আদব ও সম্মান করে থাকেন। হাদীসে বলা হয়েছে,

فاطمة بضعة منى من اذاها فقد اذانى.

ফাতিমা রাযি. আমার কলিজার টুকরো। যে তাকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল। এ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সাহাবী হওয়ার কারণে নির্ধারণ করা হয়নি। কারণ এ মর্যাদার কথা অন্য সাহাবায়ে কেরামের বেলায়ও রয়েছে; বরং এ মর্যাদার বিষয়টি শেখানো হয়েছে নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান হওয়ায় ও তার সাথে রক্তের সম্পর্ক হওয়ায়। মোটকথা, এখানে রক্ত সম্পর্কিত নিসবতের আদব শেখানো হয়েছে।

এ জন্যই বলা হয়েছে ফাতিমা রাযি. আমার কলিজার টুকরা। এ কথা বলা হয়নি যে, ফাতিমা আমার সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবিয়্যাতের সাথে অন্য কিছু এখানে একত্রিত হয়েছে এবং তা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য। তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অংশবিশেষ। যার অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহাব্বত থাকবে, তার অন্তরে অবশ্যই আওলাদে রাসূলেরও মুহাব্বত থাকবে।

আমি আমার মুরব্বীদের নিকট দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী রহ. সম্পর্কে শুনেছি, তিনি আদবের প্রতি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। সৈয়দ বংশের কোন বাচ্চা ছেলেও তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি বিছানার শিয়রের দিক থেকে পায়ের দিকে চলে যেতেন এবং ঐ ছেলেকে শিয়রের দিকে বসাতেন ও বলতেন, এঁরা বিশ্ববাসীর সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। এদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা বিশ্ববাসীর ওপর ওয়াজিব। অথচ ছেলেটি নাবালিগ। কিন্তু তিনি বলতেন এরা 'মখদুমযাদা'। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওলাদ ও তাঁরই বংশধর।

হযরত মাওলানা কাসিম নানুতবী রহ. ও অন্যান্য দেওবন্দী আলেম কলীর শরীফ গিয়ে কোন বিদ'আতমূলক ওরসের কাছেও ঘেঁষতেন না। কিন্তু আল্লাহ ওয়ালাদের মাযারে হাযির হতেন। কলীর শরীফ 'রুড়কী' হতে পাঁচ ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। রাস্তাটি নদীর তীর ঘেঁষে। হযরত রহ. পথ চলাকালীন পাদুকা খুলে ফেলতেন। ছয় মাইল দীর্ঘ পথ জুতাবিহীন খালি পায়ে অতিক্রম করতেন। এ ছিল আদবের শান। এমন করা শরীয়তের বিধানে যদিও জরুরী নয়। কোন স্থানকে লক্ষ্য করে জুতা খুলে চলার আদেশ শরীয়তে দেয়া হয়নি। কিন্তু আদবের শান ও প্রাধান্য যখন লক্ষ্য করা হয় তখন এমন সব আশঙ্কা ও সংশয় দেখা দেয় যে, যদিও শরীয়তের বিধি-বিধানে এসবের নাম-নিশানাও নেই, কিন্তু আত্মা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, এও আদবের অন্তর্ভুক্ত; এর উপর আমল করা প্রয়োজন। তবে এ আমল কানুনী ও বিধিবদ্ধ আমল নয়; বরং নৈতিক ও আখলাকী আমল। আইনের ভাষায় এসবকে ওয়াজিব, মুস্তাহাব কিছুই বলা যাবে না। কিন্তু ভক্তি ও ভালবাসার আইনে এসব জিনিস ওয়াজিব তুল্য।

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ রহ. যখন হিজরত করে মক্কা শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তিনি জীবনভর কালো রঙের জুতা ব্যবহার করেননি। কালো অথবা অন্য কোন রঙের জুতা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নয় বটে; কিন্তু বায়তুল্লাহর গিলাফের রং কালো। কাজেই এ রঙের জুতা ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। পাগড়ী ব্যবহার করতেন কালো রঙের। মাথায় ধারণ করা আদবেরই পরিচায়ক; কিন্তু পায়ে ব্যবহার করা তা নয়।

এখন যদি আপনি প্রশ্ন করেন, এমন কথা কোনও হাদীসে আছে কি? তবে বলা হবে, হাদীসে আদব ও সম্মান করার কথা বলা হয়েছে, আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু আদব যখন মানবপ্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে মেজায ও স্বভাবের রূপ গ্রহণ করে তখন ক্ষীণ হতে ক্ষীণ জিনিসও আদবের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যায় এবং মানুষ তা পালনও করে। যেমন ফকীহগণ লিখেছেন, কোনও কোনও জিনিসের বৈধতার সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন, অনেক আশঙ্কা থাকে। কিন্তু আদবের বেলায় তা গ্রহণীয় এবং প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে।

মোটকথা, এভাবে আদব শিখানো হয়েছে। আদব ব্যতীত দীনের হিফাযত ও সংরক্ষণ কঠিন ব্যাপার। অন্তরে যদি এসবের প্রতি সামান্যতম তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভাব বিদ্যমান থাকে, তবে তার দীন নিরাপদ থাকতে পারবে না। এজন্য অন্তরে আদবের গুরুত্ব, সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকতে হবে। আয়াত, রিওয়ায়াত, কুরআন-হাদীস এবং ঐ সকল ব্যক্তির সাথে যাদের সম্পর্ক কুরআন-হাদীসের সাথে রয়েছে। তাদের আদব ও সম্মান করা অত্যন্ত জরুরী। এ ব্যতীত দীন নিরাপদ থাকতে পারে না।

ইখতিলাফী রায় বা মতপার্থক্য

মাশায়েখ লিখেছেন, কোনও ব্যক্তি যদি কোন শাইখের হাতে বাইয়াত হয়ে থাকে এবং পীরকে সু ন্নাতের খেলাফ কোনও কাজ করতে দেখে আর তখনই ইচ্ছা করে যে, সু ন্নাতের পাবন্দ অন্য কোন পীরের হাতে বাইয়াত হবে। এমতাবস্থায় মাশায়েখ ঐকমত্য পোষণ করে লিখেছেন যে, সু ন্নাতের খেলাফ আমল প্রকাশ পায় এমন পীরের বাইয়াত ভঙ্গ করে দেয়া উচিত। কিন্তু তার সম্পর্কে বেআদবী ও গোস্তাখীমূ লক কোন বাক্য কখনও উচ্চারণ করা উচিত নয়। তার সাথে বেআদবী করা জায়েয নয়। এতে তার ইজ্জত ও রূহানিয়াত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটাও ঐ আদবেরই বু নিয়াদ। মনে করুন, কোন আলেমের সাথে কোনও মাসআলার ব্যাপারে আপনি দ্বিমত পোষণ করেন অথবা কোনও আলেম আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন তাহলে মাসআলার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য বা দ্বিমত পোষণ করা জায়েয। আপনি নিজেকে সততার সাথে সত্যান্বেষী বলে মনে করলে অন্যের সাথে বেআদবী, অন্যকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা জায়েয নয়। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা দীনের জন্য ক্ষতিকর এবং মু হাব্বত ও আন্তরিকতার সাথে দ্বিমত হয়ে যাওয়া দীনেরই অঙ্গ। দ্বিমত করা জায়েয কিন্তু দীনকে নিয়ে বিরোধিতা করা জায়েয নয়।

শরীয়ত সম্পর্কীয় আদেশ-নিষেধ যেহেতু ব্যক্তিগত মতামতের উপর নয়, এজন্য এক্ষেত্রে বিরোধিতা করার অধিকার নেই, জায়েযও নয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ...

'মু মিন নর-নারীর জন্য জায়েয নয় যে, যখন কোনও বিষয়ে আল্লাহ ও তঁ ার রাসূ লের নির্দেশ এসে যায় তখন এ সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করবে।' (সূ রা আহযাব- ৩৬) আহকামে শরীয়ত রাসূ ল কর্তৃ ক পেঁ ৗছে দেয়ার পর এ নিয়ে কোনওরূপ দ্বিধা-সংশয় জায়েয নয়। গ্রহণ করা ও না করার এখতিয়ার থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না।

আলেম ও ওলীগণের মধ্যে যদি মতবিরোধ দেখা দেয় কোনও বাধা নেই, কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বেআদবী করা এবং তাদের তু চ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা কোনও অবস্থায়ই জায়েয নয়। এজন্য যে, তারা আলেমে দীন, ধর্ম বিশেষজ্ঞ। তাদের সাথে আপনি দ্বিমত প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু নায়েবে রাসূ ল হিসেবে তাদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে, করা ওয়াজিব। নষ্ট করা যাবে না।

আমরা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ফিকহের অনু সরণ করি। ইমাম শাফেঈ রহ. বহু মাসআলায় তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু সেজন্য ইমাম শাফেঈ রহ. এর প্রতি আমাদের অন্তরে অণু পরিমাণও বেআদবীর উদ্রেক হয় না। যেমন ইমাম আবু হানীফা রহ. সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র, তদ্রূপ ইমাম শাফেঈ রহ.-ও সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। দু 'জনই সমমর্যাদার অধিকারী। উভয়েই নূ র ও বরকত লাভ করেছেন। তাদের সাথে সামান্যতম বেআদবীও কোনওভাবে জায়েয হবে না।

গোস্তাখী মূ র্খতার পরিচায়ক

গোস্তাখী ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মূ র্খতার পরিচায়ক। হযরত মূ সা আ. যখন কওমকে উপদেশ দিলেন এবং বললেন, অমু ক নিহত ব্যক্তি পু নর্জীবিত হয়ে বলে দিবে তার হত্যাকারী কে– যদি একটি গাভী জবাই করে তা থেকে এক টু করো গোশত নিহত ব্যক্তির দেহে লাগিয়ে দেয়া হয়। তখন বনী ইসরাঈল বলতে লাগল أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন? মৃ তের পু নর্জীবন লাভের সাথে গোশত মিলানোর কী সম্পর্ক রয়েছে? মূ সা আ. বললেন,

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, জাহিল-মূ র্খদের দলভু ক্ত হয়ে যাওয়া থেকে। অর্থাৎ ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-মজাক করা হলো মূ র্খ-জাহিলদের কাজ, আলেমদের জন্য তা শোভনীয় নয়। এজন্য যে, হাসি-মজাক করা হলো আদব ও শ্রদ্ধার পরিপন্থী। যাক, এক হলো মতের অমিল, আরেক হলো মাসলাকের ইখতিলাফ। আর বেআদবী গোস্তাখী হলো অন্য জিনিস। বেআদবী কোনও অবস্থায়ই জায়েয নয়, তবে ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য জায়েয।

হযরত মাওলানা থানবী রহ. ও মাওলানা আহমদ রেযা খান

আমি হযরত মাওলানা থানবী রহ. কে দেখেছি, মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবের সাথে তার অনেক বিষয়ে মতবিরোধ ছিল। কিয়াম, মীলাদ, ওরস ইত্যাদি অনেক মাসআলায় বিরোধ ছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু যখন তার মজলিসে খান সাহেবের আলোচনা আসত, তখন তিনি আদবের সাথে তার নাম উচ্চারণ করে বলতেন, 'আহমদ রেযা খান সাহেব'। একবার মজলিসে এক ব্যক্তি খান সাহেবের নাম তাচ্ছিল্যভরে উচ্চারণ করে বললেন, 'আহমদ রেযা খান'। 'মাওলানা' বললেন না। এজন্য হযরত তাকে ধমকালেন, নারায হলেন এবং বললেন, তিনি তো আলেম, যদিও আমার সাথে মতবিরোধ রয়েছে। তোমরা তার পদমর্যাদার অবমাননা করছো, এটা জায়েয হবে কেমন করে? মতবিরোধ এক জিনিস এবং তাকে ভু ল ও ভ্রান্তির উপর মনে করা আরেক জিনিস। কিন্তু তাকে অবমাননা করা, তার সাথে বেআদবী করা, তা হয় না।

আমি হযরত মাওলানা কাসেম নানু তবী রহ. এর ঘটনা শুনেছি। তিনি দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। হযরতের খাদিমগণের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন শাগরিদও সাথে ছিলেন। শাইখু ল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমু দ হাসান দেওবন্দী, হযরত মাওলানা আহমদ হাসান আমরুহী, হাজী আমির শাহ খান সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মাওলানা আহমদ হাসান তার সঙ্গীদেরকে বললেন, লালকূ প মসজিদের ইমাম সাহেবের কিরাআত অত্যন্ত মধু র। আগামীকাল ফজরের নামায তার পিছনে পড়ে নিই। হযরত শাইখু ল হিন্দ উত্তেজিত হয়ে বললেন, তোমার লাজ-লজ্জা নেই!? সে আমাদের হযরতকে কাফের বলে, আমরা কি করে তার পিছনে নামায পড়ব? অর্থাৎ তিনি কঠোর ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করলেন। কথাগুলো হযরত নানু তবীর কর্ণগোচর হলো। পরদিন প্রত্যু ষে ঐ ইমামের পিছনে নামায আদায় করার জন্য তিনি এসব শাগরিদকে সঙ্গে নিয়ে ঐ মসজিদে উপস্থিত হলেন এবং ঐ ইমামের পিছনে নামায আদায় করলেন। ইমামসহ সবাই সালামের পর দেখলেন, অপরিচিত ও নবাগত কয়েকজন মু সল্লী উপস্থিত হয়েছেন। আর সবাইকে আলেম বলে মনে হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কারা? উত্তরে জানতে পারলেন, ইনি হযরত মাওলানা কাসেম সাহেব, আর অন্যরা তারই শাগরিদ। এরা হলেন শাইখু ল হিন্দ হযরত মাহমূ দ হাসান, মাওলানা আহমদ হাসান মু হাদ্দিসে আমরুহী। ইমাম সাহেব বিস্ময়াভিভূ ত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, আমি রাত দিন

এদেরকে কাফের ফাতওয়া দিয়ে বেড়াই, আর তারা আমার পিছনে নামায পড়ার জন্য এসেছেন! ইমাম সাহেব নিজেই অগ্রসর হয়ে মু সাফাহা করলেন এবং বললেন, হযরত! আমি আপনাকে কাফের বলে থাকি। আমি আজ অত্যন্ত লজ্জিত। আপনি আমার পিছনে নামায পড়েছেন, অথচ আমি আপনাকে কাফের বলে থাকি। হযরত বললেন, এ কিছু নয়। আমার অন্তরে আপনার বিবেক-বু দ্ধির মূ ল্য রয়েছে। তাই আপনার মর্যাদা আমার অন্তরে বৃ দ্ধি পেয়েছে। এজন্য যে, আপনি একথা শুনেছেন, আমি রাসূ লের অবমাননা করি। রাসূ লের অবমাননার উপর আপনার ঈমানের দাবি ঠিকই আদায় করেছেন। কিন্তু দু ঃখ ও অভিযোগের বিষয় হলো, কথা শুনে এর সত্যাসত্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন ছিল। যা হোক, কাফের বলার কারণ রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবমাননা। যে কোন মু সলমান রাসূ লের অবমাননা করবে, তাকে কাফের বলা ওয়াজিব। ইসলামের গণ্ডি হতে সে বহিষ্কৃ ত হয়ে পড়বে। আমার অন্তরে আপনার ঈমানী গাইরতের মূ ল্য ও মর্যাদা রয়েছে। তবে এ অভিযোগও রয়েছে যে, অন্তত পরীক্ষা করে দেখা দরকার ছিল যে, যে কথা আপনি শুনেছেন, তা সত্য না মিথ্যা। আমি নিজেও এমন ব্যক্তিকে ইসলামের গণ্ডি বহির্ভূ ত মনে করি, যে নবীর সামান্যতম অবমাননাও করে। আপনার যদি বিশ্বাস না হয় তবে আমি আপনার হাতে পু নরায় ইসলাম গ্রহণ করছি, اشهد ان لا اله الا الله বেচারা ইমাম হযরতের পায়ের উপর লু টিয়ে পড়ল। হযরতের অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিনয় ছিল। আল্লাহর প্রতি আদব, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ অন্তরে এ পরিমাণ ছিল যে, তাতে নফসানিয়াতের ছিটেফোঁ টাও ছিল না। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তো দূ রের কথা, চরম শত্রু ও বিদ্বেষীরও তিনি অবমাননা করতেন না। তিনি বরং তাদের কথার যথাসম্ভব সঠিক অর্থ গ্রহণকরত বলতেন, তারা আমাদেরকে কাফের বলে। এ হলো তাদের সু দৃ ঢ় ঈমানের পরিচায়ক। তবে পরীক্ষা করে দেখা কর্তব্য ছিল যে, প্রকৃ তই আমরা রাসূ লের অবমাননা করি কি না। এরূপ করা তাদের জন্য ওয়াজিব ছিল। তাহকীক ও অনু সন্ধান না করে হুকু ম লাগানো উচিত হয়নি। আমার দীর্ঘ আরযের উদ্দেশ্য হলো, আদব ও শ্রদ্ধাবোধ দীনের ভিত্তি। যা আরিফ রূমী বলেছেন,

از خدا جوئیم توفیق ادب
بے ادب محروم گشت از فضل رب

আদবের জন্য আল্লাহর নিকট তাওফীক প্রার্থনা করছি, বেআদব আল্লাহর ফযল ও দয়া হতে বঞ্চিত। বেআদব গোস্তাখের কোনও মূ ল্য ও মর্যাদা নেই আল্লাহর দরবারে।

আদব হতে উদাসীনতার ভয়াবহ পরিণাম

কথা হলো, দীনের ভিত্তি আদব-ভক্তি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ হলো শরীয়তের বিরাট একটি অধ্যায়। যেখানে আহকাম রয়েছে, সেখানে আদবও রয়েছে। মানু ষ যদি আদব রক্ষা করতে সামর্থ্য না হয়, তবে সে মূ ল আহকাম হতেও বঞ্চিত থেকে যায়। এ জন্যই আদবের প্রয়োজন। হযরত শাহ আব্দু ল আযীয রহ. তার *তাফসীরে ফাতহুল আযীয* এ একটি হাদীস উদ্ধৃ ত করেছেন,

من تهاون فى الادب حرم السنة ومن تهاون بالسنة حرم من الواجبات ومن تهاون بالواجبات حرم من الفرائض ومن تهاون بالفرائض حرم من المعرفة.

যে ব্যক্তি আদব পালনে আলস্য প্রদর্শন করে, সে সু ন্নাত হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সু ন্নাতের উপর আমল করা হতে আলস্য করে, সে ওয়াজিব হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি ওয়াজিব আদায়ে অলস ও উদাসীন থাকবে, সে ফরয হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। যে ফরয হতে উদাসীন থাকবে, সে আল্লাহর মা'রিফাত ও সঠিক পরিচয় লাভ হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

ফরযের উপর আমল অব্যাহত থাকলে আল্লাহর প্রেম-প্রীতি বৃ দ্ধি পাবে। এ জন্য সু ন্নাতকে ফরয আদায়ের প্রধান সাহায্যকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সু ন্নাত ত্যাগকরত শুধু মাত্র ফরয আদায় করল, সে অচিরেই ফরয হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এমনকি ফরযও পড়বে না– এমন দিন তার জন্য এসে যাওয়া অসম্ভব নয়।

আইম্মায়ে মু জতাহিদীনের পারস্পরিক আচরণরীতি

আইম্মায়ে মু জতাহিদীনেরও এ নিয়ম-রীতি ছিল যে, পরস্পরের মধ্যে বাহ্যিক মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও আদব, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধে এতটু কু ত্রুটি-বিচু ্যতি তাদের মধ্যে ছিল না। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মাযহাবে নামাযে সূ রা ফাতিহা শেষে 'আমীন' আস্তে বলা উত্তম এবং ইমাম শাফেঈ রহ. এর মাযহাবে উচ্চস্বরে বলা উত্তম। কিন্তু যখন ইমাম শাফেঈ রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মাযারের নিকটস্থ মসজিদে নামায আদায় করতেন তখন সূ রা ফাতিহা পাঠান্তে আমীন আস্তে পড়তেন এবং বলতেন, এ মাযারে শায়িত বু যু র্গের কারণে আমি লজ্জাবোধ করছি যে, তার মাযারের নিকট দাঁ াড়িয়ে তার ইজতিহাদের বিরুদ্ধাচরণ করি। এ ছিল আদব ও শ্রদ্ধাবোধ। এটা হারাম ও হালাল, জায়েয ও নাজায়েযের পার্থক্য ছিল না। অর্থাৎ একজন জায়েয বলেছেন, অন্যজন হারাম ও নাজায়েয বলেছেন এমন নয়। এমতাবস্থায় একজন অন্যজনের মাযহাবের উপর আমল করতে পারতেন না। কিন্তু যেখানে উত্তম হওয়ার বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, সেখানে আদব ও শ্রদ্ধার পরিচয় দেয়া যেতে পারে। ইমাম শাফেঈ তার মাযহাব অনু যায়ী উত্তমের উপর আমল করা ত্যাগ করেছেন এবং আমল করেছেন ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সম্মানার্থে তার মাযহাবের উপর। অথচ ইমাম সাহেব তখন চিরশয্যায় শায়িত, সম্মু খে হাযির নন। তথাপি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের এ অবস্থা ছিল।

মাসাইল এবং প্রবৃ ত্তির আবেগ প্রবণতা

হযরত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও মতপার্থক্য ছিল। আইম্মায়ে কেরামের মধ্যে ইজতিহাদী মাসআলার ক্ষেত্রে যেরূপ মতপার্থক্য ছিল, সাহাবায়ে কেরমের মধ্যেও তেমনি ছিল। আদব, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের প্রতি বিরূপ মনোভাব ও পার্থক্য সৃ ষ্টি করা মাসাইলের কাজ ও প্রকৃ তিগত বৈশিষ্ট্য নয় যেমনটি আমাদের মধ্যে হয়ে থাকে; বরং ঝগড়া-ফাসাদ সৃ ষ্টি হয়ে থাকে। প্রবৃ ত্তির আবেগপ্রবণতার আধিক্যের কারণে আমরা শত্রুতা প্রকাশের জন্য মাসাইলকে মাধ্যম ও বাহন করে নিয়েছি। যদি ঝগড়া-ফাসাদই মাসাইলের প্রকৃ তিগত বৈশিষ্ট্য হতো, তবে সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কেরাম ঝগড়া-ফাসাদ, যু দ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতেন। তাদের মধ্যেও তো মতপার্থক্য ছিল। তারপর আইম্মায়ে মু জতাহিদীনের মধ্যে লাঠির শক্তি পরীক্ষা হতো। তারপর উলামায়ে রব্বানী পরস্পরে লড়াই-যু দ্ধে লিপ্ত হতেন। কিন্তু মতপার্থক্যও ছিলো, আদব-সম্মানও

যথাস্থানে ছিলো। আমরা কিন্তু মতপার্থক্যের নামে নিজের প্রবৃ ত্তিগত আবেগ-উত্তেজনা প্রকাশ করি। আর আমি তো বলে থাকি যু দ্ধ-বিগ্রহের প্রকৃ ত কারণ ও উপাদান হলো বিষয়-সম্পত্তি, বাসভবন, ক্ষেত-খামার, ও জায়গা-জায়গীর। মু সলমানদের হাতে এখন এ সমস্ত জিনিস বাকী নেই। না আছে বিষয়-সম্পত্তি, না আছে দালান-কোঠা, না আছে রাজ্য ও রাজমু কু ট। তাই তারা ভেবেছে, কী আর করা! দীনকেই তাহলে যু দ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যম বানিয়ে নেই আর মাসাইলকে হাতিয়ার রূপে গ্রহণ করি। অথচ মাসাইলের মধ্যে এসব ব্যাপারে বিশেষত্ব নেই। ইখতিলাফ করার সু যোগ ও অনু মতি রয়েছে। কিন্তু লড়াই-যু দ্ধ করার কোনও বৈধতা নেই। এ বিষয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

ইখতিলাফী মাসাইলের ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা

মাসআলায় যদি মতাধিক্য থাকে তা বর্ণনা করাতে বাধা নেই। কিন্তু লড়াই-যু দ্ধ করা কেন? যার কবরে সেই যাবে; তু মি তোমার কবরে আর সে তার কবরে। তু মি তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছ এবং তারও কি অধিকার রয়েছে তোমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার? তিনি মাসআলা বর্ণনা করে দিয়েছেন, 'আমর বিল-মা'রূফ' করেছেন। ব্যস, এতটু কু তেই দায়িত্বমু ক্ত হয়েছেন, পরিত্রাণ লাভ করেছেন। এখন যদি কেউ না মানে, এতে তোমার কি আসে যায়? তার নিকট কোন দলীল-প্রমাণ যদি থাকে সে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবে। এর জন্য তো তু মি দায়ী ও দায়িত্বশীল নও। পরকালে তার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তার দীন ও দীনের মৌলনীতি গ্রহণ সম্পর্কে কাউকে বাধ্য করা যাবে না, করার প্রয়োজনও নেই। মোটকথা, বর্তমান যু গে ক্ষু দ্র ক্ষু দ্র মতবিরোধের কারণে মানু ষ ফিতনা-ফাসাদের দ্বার উন্মু ক্ত করে দেয়। এতে মু সলিম সমাজে বিভেদ-বিচ্ছেদ, বিশৃ ঙ্খলা ও ঝগড়া-ফাসাদ সৃ ষ্টি হয়। এতে মু সলমানদের শক্তি খর্ব ও ধ্বংস হয়।

হযরত শাইখ আব্দু ল কাদির জিলানী রহ. এর মূ ল্যবান উপদেশ

হযরত শাইখ আব্দু ল কাদির জিলানী রহ. তার এক মু রীদকে খিলাফত দানে ধন্য ও ভূ ষিত করলেন এবং বললেন অমু ক স্থানে গিয়ে দীনের তাবলীগ ও প্রচার করতে থাক। প্রস্থানের প্রাক্কালে মু রীদ আরয করল, আমাকে উপদেশ দান করুন। শাইখ বললেন, তোমাকে দু 'টি উপদেশ দিচ্ছি। খোদায়ী দাবি করো না এবং নবু ওয়াতের দাবী করো না। মু রীদ হতভম্ব হয়ে বলল, হযরত! আমি অনেক বছর আপনার মু হাব্বত ও সাহচর্যে কাটিয়েছি। এখনও কি এ ভয় ও আশঙ্কা রয়েছে যে, আমি আল্লাহ হওয়ার ও নবী হওয়ার দাবী করব? বললেন, খোদায়ী ও নবু ওয়াতের দাবী করার অর্থ সঠিকভাবে বু ঝে নাও, তারপর যা বলার বল। আল্লাহ তা'আলা এমন যাত ও এমন সত্তা যে, তিনি যা বলবেন তাতে অটল থাকবেন, তঁ ার সাথে দ্বিমত পোষণ ও মতবিরোধ হতে পারে না। যে ব্যক্তি নিজের মতকে এভাবে প্রকাশ করে যে, সে তার মতের উপর অটল, অনড় এবং এর বাইরে কোনও মত হতে পারে না। কোনও মানু ষ যদি স্বীয় মতের উপর এভাবে অটল-অনড় থাকে, তবে এর চেয়ে অধিক খোদায়ীর দাবী আর কি হতে পারে? আর নবী হলেন ঐ সত্তা তিনি যা বলেন তা সত্য, কখনো তা মিথ্যা হতে পারে না। তো যে ব্যক্তি তার কথা সম্পর্কে বলে, এ কথা এমনই সত্য যে, এর বিপরীত হতে পারে না। এ যেন পর্দার অন্তরালে নবু ওয়াতের দাবি যে, আমার কথার ভু ল হতে পারে না। অথচ এ হলো তার ব্যক্তিগত মতামত মাত্র।

সংশোধন না ফাসাদ

কোনও ব্যক্তি যদি নিজের গবেষণালব্ধ মতামতের উপর এমন অটল হয়ে পড়ে যে, কারও অপারগ অবস্থা বু ঝতে চায় না। তাহলে প্রকৃ তপক্ষে এ দ্বারা সাধারণ মু সলমানদের সংশোধন করা যায় না; বরং তাদের মধ্যে ফাসাদ ছড়ানো হয়। কাজেই একটি কথা বলে দেয়ার পর এবং তার ঘোষণা ও প্রচার হওয়ার পর বারংবার বলার প্রয়োজন নেই। যারা অনু সরণকারী, তাদেরকে একবার বলাই যথেষ্ট। আর যারা মানবে না, তাদের জন্য তু মি দায়ী নও। তু মি খোদায়ী কন্ট্রাক্টর নও যে, একটি মাসআলা বারবার প্রচার করতে থাকবে আর তার উপর জেদ করতে থাকবে। এ দ্বারা অযথা সাধারণ মানু ষের মধ্যে কলহ-বিবাদ সৃ ষ্টি হয়। তু মি বলে চলে যাবে, আর বিপদে পতিত করবে সাধারণ মু সলমানদেরকে।

তাবলীগী ও তারজিহী মাসআলার পার্থক্য

একটি হলো দীনের উসূ ল বা মূ লনীতি। যেমন নামায ফরয, রোযা ফরয, যাকাত ফরয। আপনি তা জোরের সঙ্গে বলতে পারেন, বারবার বলতে পারেন। কিন্তু শাখাগত ও ইজতিহাদী (গবেষণালব্ধ) ব্যাপারে আপনি শক্ত হবেন, জোরে শোরে প্রচার করবেন, তা হয় না। কারণ এসব তাবলীগী বা প্রচারযোগ্য বিষয়ই নয়।

আপনি কোন মর্মে কিসের উপর আপনার শক্তি ব্যয় করছেন? মাযহাবের মাসআলাসমূ হ প্রচারে তো কড়াকড়ি করা যায় না। যেমন আপনি মঞ্চে দঁ াড়িয়ে বলবেন, ভাইসব! আপনারা হানাফী হয়ে যান, শাফেঈ হবেন না। অথবা শাফেঈ হয়ে যান হানাফী হবেন না। এটা করা যাবে না। কারণ এসব মাযহাব হলো তারজিহী যা এক ইমাম একটিকে আর আরেক ইমাম অন্যটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন মাত্র। এসব প্রচারের বস্তু নয়। যেমন অমু ক আমল ওয়াজিব অথবা শ্রেষ্ঠ, অমু ক আমল তা নয়। কাজেই তারজিহী মতামতকে তাবলীগী করবেন না। কোনও আলিমকেই কোনও গবেষণালব্ধ বিষয়ের উপর জেদ করা উচিত নয়।

আজকাল এসব জিনিসের প্রসারতা লাভ হয়ে গেছে, অনেক বেআদবী ও গোস্তাখী হচ্ছে! তাই এ কয়েকটি কথা আরয করলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের আমলের তৌফীক দিন। আমীন ॥

লেখক :

জগদ্বিখ্যাত আলেমে দীন, দারুল উলূ ম দেওবন্দের সু দীর্ঘ ৫৩ (১৩৪৮ হি. - ১৪০১ হি.) বছরের মু হতামিম।

প্রাণীর ছবি (২৯ পৃ ষ্ঠার পর)

قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون

আল্লাহ তাদের বিনাশ করুন যারা এমন কিছু র ছবি অঙ্কন করে যা তারা সৃ ষ্টি করতে পারে না। (মু সান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা. ২৫৭২২)

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابى درنوكا فيه الخيل ذوات الاجنحة فأمرني فنزعته

রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। আমি দরজায় একটি ঝালরযু ক্ত পর্দা ঝু লিয়েছিলাম।

যাতে পাখাওয়ালা ঘোড়ার ছবি অঙ্কিত ছিল। তিনি তা খু   লে ফেলার আদেশ দিলে আমি তা খু   লে ফেললাম। (সহীহ মু   সলিম; হা. ২১০৭)

উল্লেখ্য যে, (ক) ছবি নিষিদ্ধের হাদীসগুলো হাদীসের প্রায় কিতাবে এমনকি সহীহ বু   খারীতেও পোশাকের অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। আর পোশাকে দেহ বিশিষ্ট ছবি নয়, অঙ্কিত ছবিই থাকে। (খ) কোনও কোনও বর্ণনায় ছবি অঙ্কনকারীকে প্রাণীর ছবি বাদ দিয়ে গাছপালা ও পাহাড়-পর্বতের দৃ   শ্য বানাতে বলা হয়েছে, যা দেহ বিশিষ্ট হওয়ার কথা নয়। (গ) বাইতু   ল্লাহয় রাখা ছবি বালতির পানিতে মু   ছে দেয়ার দ্বারাও বু   ঝে আসে যে, সেখানে তু   লিতে অঁ   াকা ছবিও ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হাতে তৈরি প্রতিকৃ   তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকারীকে বলেছেন,

إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح.

প্রতিকৃ   তি যদি তৈরি করতেই হয় তবে গাছপালা ও প্রাণহীন বস্তুর প্রতিকৃ   তি তৈরি করবে। (সহীহ বু   খারী; হা.২২২৫)

ছবি দ্বারা সব ধরনের প্রাণীর প্রতিকৃ   তি এবং চিত্র উদ্দেশ্য

হযরত আলী রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, জিবরাইল আ. বলেছেন,

انها ثلاث لن يلج ملك ما دام فيها أبدا واحد منها كلب أو جنابة أو صورة روح إسناده ضعيف

যতক্ষণ পর্যন্ত এই তিন জিনিস ঘরে থাকবে ফেরেশতারা তাতে কখনো প্রবেশ করবে না– কু   কু   র, গোসল ফরয হয়েয়ে এমন ব্যক্তি কিংবা কোন প্রাণীর ছবি। (মু   সনাদে আহমদ; হা.৬৪৮)

আল্লামা ইবনে আব্দু   ল বার বলেন, হাদীসের ভাষ্য احيوا ما خلقتم (যা তোমরা সৃ   ষ্টি করেছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার করো) থেকে বোঝা যায় ছবি দ্বারা প্রাণীর ছবি উদ্দেশ্য। (আত-তামহীদ ৮/৫২৭)

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

প্রদীপ থেকে প্রদীপ জ্বলে

মাওলানা সা'দ আরাফাত

: আস্‌সালামু আলাইকুম।
: ওয়াআলাইকুমুস সালাম।
: কেমন আছেন?
: ভালো, আলহামদুলিল্লাহ!
: আপনি কি মজলিসে এসেছেন?
: জ্বি, আল্লার ইচ্ছায়।
: প্রতি সপ্তায় আসেন?
: আলহামদুলিল্লাহ, চেষ্টা করি।
: আপনার বাসা কোথায়?
: সাভার, হেমায়েতপুর। চিনেন?
: সাভার! এতো দূর থেকে আসেন?
: আল্লায় না আনলে কী কইরা সম্ভব!

২২ ফেব্রুয়ারী ২০১৪, শনিবার। হিজরী তারিখে ২১ রবিউস সানী। ঢাকা আজিমপুরের ঐতিহ্যবাহী ছাপড়া মসজিদে কথা হচ্ছিলো বর্ষীয়ান 'মাওলানা দেলোয়ার সাহেব' এর সাথে। অশীতিপর বার্ধক্য নিয়ে তিনি সুদূর সাভারের হেমায়েতপুর থেকে আজিমপুর ছুটে এসেছেন আত্মার টানে। বাদ মাগরিব চায়না বিল্ডিং গলিতে প্রফেসর হযরতের মজলিসে শরীক হবেন। তাঁর কথায় জানলাম, তিনি লালবাগ মাদরাসার সোনালী যুগে হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর দরসে ছাত্র ছিলেন। হাফেজ্জী হুযুরের ইন্তিকালের পর তাঁর সান্নিধ্যের অভাবে যখন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তখন প্রফেসর হযরতের এই মজলিসের সন্ধান পান। মরহুম মুরশিদের হারানো সেই সান্নিধ্যের দ্যুতি অনুভব করেছিলেন প্রফেসর হযরতের মজলিসে। তখন থেকে আজ অবধি তিনি এই মজলিসের নিত্যসঙ্গী। আশি পেরুনো বার্ধক্যের কষ্ট পেছনে ফেলে অদৃশ্য কোনও শক্তির প্রবল আকর্ষণে প্রতি সপ্তাহে ছুটে আসেন পরশ পাথরের সান্নিধ্যে।

আজিমপুরের বিখ্যাত ছাপড়া মসজিদের পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণমুখী চায়না বিল্ডিং গলি। এ গলিরই ১৬৩ নং বাসায় প্রতি শনিবার বাদ মাগরিব ইসলাহী মজলিস হয়ে থাকে। মজলিসটির প্রাণপুরুষ হাফেজ্জী হুযুর ও হারদুয়ীর হযরত (রহ.)-এর স্বনামধন্য খলীফা হযরত প্রফেসর হামীদুর রহমান সাহেব (দা.বা.)। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অবসরপ্রাপ্ত এ কীর্তিমান অধ্যাপক বুযুর্গানে দীনের দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্য গ্রহণ করে দীনের এক আলোকমিনারে পরিণত হয়েছেন। ফলে তাঁর মজলিসে আজ আলোপ্রত্যাশী মানুষের উপচেপড়া ভীড়।

২২ ফেব্রুয়ারী শনিবার বাদ মাগরিব এই মহতি মজলিসের সাদামাটা অপার্থিব চিত্র প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়। মজলিসের জন্য নির্ধারিত কক্ষটি আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বেই পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। দীনী কথা শোনার অপেক্ষায় থাকা চাতকপ্রাণ মানুষগুলোর প্রতীক্ষার অবসান হলো প্রজ্ঞাবান তরুণ আলেমে দীন মাওলানা হাবীবুর রহমান খান সাহেব (দা.বা.)-এর উপস্থিতিতে। তিনি দীর্ঘ সময় প্রগাঢ় হৃদ্যতার সাথে *মালফূযাতে কামালাতে আশরাফিয়া* থেকে পড়ে ও অনুবাদ করে শোনান। যা মূলত হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর বাণীসংকলন। আলোচনার মাঝে তিনি নিজেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্লভ কথা বলেন; যেগুলো জীবনের বাঁকে বাঁকে ঘটে যাওয়া নানান ভুলের সংশোধন কিংবা দীনের পথে অগ্রসরমান পথিকের জন্য অমূল্য দিকনির্দেশনা।

বিদগ্ধ আলেমে দীনের আধঘন্টা ব্যাপী তা'লীমের পর আসন গ্রহণ করেন প্রফেসর হযরতের ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার মাশহুদুর রহমান সাহেব (দা.বা.)। তিনিও একইভাবে অপর একটি কিতাব থেকে কিছু মালফূয পড়ে শোনান। তাঁর পঠিত কিতাবটি ছিলো, হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)-এর পূণ্যময় বাণী সংকলন *বেহেশতের পথ ও পাথেয়*। ইতোমধ্যে সকলের মধ্যমণি প্রফেসর হযরতের আগমনে মজলিস আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তিনি পূর্ণ শ্রদ্ধাবনত ও বিগলিত হৃদয়ে পঠিত মালফূযগুলো শ্রবণ করেন। মালফূযাত পাঠ শেষ হলে তিনি সংক্ষেপে কিছু কথা বলেন। তাঁর দুই শাইখ হাফেজ্জী হুযুর এবং হারদুয়ীর হযরত (রহ.) এর স্মৃতিচারণ করে বলেন, তারা দু'জনেই দু'টি আয়াত খুব বেশি পড়তেন– يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ...

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং পরিপূর্ণ মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।' (সূরা আলে ইমরান- ১০২)

আরেকটি আয়াত পড়তেন–

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ...

'তোমরা সেদিনকে ভয় করো যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনওরূপ অবিচার করা হবে না।' (সূরা বাকারা- ২৮১)

হযরত হাফেজ্জী হুযুর (রহ.) সবসময় বলতেন,

'ভালো কইরা তৈয়ারি করেন, ভালো কইরা তৈয়ারি করেন। অনেক কঠিন ঘাঁটি আসতেছে।'

এজন্য আল্লাহর ভয়টা হলো আসল। অন্তরে আল্লাহভীতি থাকলে আমলের আগ্রহ তৈরি হয়। আমলের আগ্রহ যাতে তৈরি হয় এজন্যই এই মজলিসগুলো। এই মজলিসের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার কথা, দীনের কথা মনে করিয়ে দেয়া। হারদুয়ীর হযরত প্রায়ই পড়তেন, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى...

'তুমি নসীহত করো, মনে করিয়ে দাও, বারবার আলোচনা করো। এটা ঈমানদারদের উপকারে লাগবেই। এতে কাজ হবেই।' (সূরা যারিয়াত- ৫৫)

প্রফেসর হযরতের ঈমানী কথায় সবার হৃদয়ে বিশ্বাসের জোয়ার আসে। পুরনো প্রত্যয় নতুন তেজে উদ্দীপ্ত হয়। ঈমান ও আমল তাজা করার এ মজলিস এশার নামাযের পূর্বে প্রফেসর হযরতের মুনাজাতের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

১৩৬ চায়না বিল্ডিং গলিতে প্রফেসর হযরতের এ মজলিসে ধর্মীয় অঙ্গনের একাধিক মুরুব্বীর আগমন ঘটে। ইংরেজি শিক্ষিত বুযুর্গানে দীনের সাথে এখানে প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের বিরল সমাবেশ ঘটে। ফলে রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে, এমন কি রাজধানীর বাইরে থেকেও নানা শ্রেণী ও পেশার মানুষ এখানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। আগ্রহী মহিলাদের

জন্য ভিন্ন কামরায় লাউড স্পিকারে বয়ান শোনার ব্যবস্থা করা হয়।

এই মজলিসে অংশগ্রহণকারী মু সলিম ভাইদের প্রত্যেকে উন্নত মানস ও অতু লনীয় চারিত্রিক সমৃ দ্ধির অধিকারী। ঈমান, ইখলাস ও তাকওয়ার পাশাপাশি তারা এ মজলিস থেকে বিনয়, নম্রতা, সততা ও সহনশীলতার মতো উন্নত চরিত্রগুণেরও দীক্ষা পাচ্ছেন। কলু ষতা ও কপটতায় অশান্ত, অস্থির আত্মাগুলো এখানে এসে প্রশান্তি লাভ করে। তৃ ষ্ণার্ত হৃদয় তার রূহের খোরাক পেয়ে নতু ন উদ্যমে ফিরে যায় আরো তৃ ষ্ণা নিয়ে, আরো অতৃ প্তি নিয়ে। হৃদয়ের তৃ ষ্ণা মিটিয়ে যেন সে আরো তৃ ষ্ণার্ত হয়। এ তৃ ষ্ণা যে মিটবার নয়! এ অতৃ প্তি যে ফু রোবার নয়!

লেখক :

মু দাররিস, জামি'আ ইসলামিয়া চরওয়াশপু র, ঢাকা

পঞ্চম খলীফা... (১২ পৃ ষ্ঠার পর)

তোমার সেই অবস্থা আজকের অবস্থা থেকে উত্তম ছিল। আমার মনে হয় তোমার ঘরের মোমবাতি দ্বারাই কাজটি চালানো উচিত।

আমল-আখলাকের প্রতি মনোনিবেশ

এ সময় পর্যন্ত মনে করা হত খলীফা শুধু শাসনই করবেন। আর জনসাধারণের আমল-আখলাক, আচার-আচরণ বিষয়ক ওয়াজ নসীহত করবেন কেবল উলামায়ে কেরাম। তিনি এ জাতীয় ধারণার অবসান ঘটিয়ে প্রত্যেক আমলা ও ফৌজি অফিসারদেরকে এ বিষয়ে পূ র্ণ যত্নবান হতে বলেন। আল্লামা ইবনু ল জাওযী রহ. লিখেছেন, খলীফা হওয়ার পর উমর ইবনে আব্দু ল আযীয রহ. যে কোন চিঠি লিখেছেন বা ফরমান জারি করেছেন তাতে তিনটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ থাকত। (১) রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সু ন্নাতের পু নর্জীবন দান। (২) শরীয়ত বিরোধী নিয়ম-প্রথার বিলোপ সাধন। (৩) জনগণের মধ্যে জাতীয় সম্পদের ইনসাফপূ র্ণ বণ্টন। এভাবে তিনি আমলা, অফিসারসহ জনসাধারণের আমল আখলাকের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন।

অমু সলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত

তিনি কেবল মু সলমানদের ইসলাহ ও রাষ্ট্রে ইসলামী শরীয়া কার্যকর করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি। অমু সলিমদের মাঝেও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। আল্লামা বালাযু রী তার *ফাতহুল বু লদান* এ লিখেছেন, হযরত উমর ইবনে আব্দু ল আযীয রহ. ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের নিকট সাতটি পত্র লিখেন। এতে তাদেরকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন। এদিকে পূ র্বেই উমর ইবনে আব্দু ল আযীয রহ. এর চরিত্র ও কার্যাবলীর সু খ্যাতি তাদের কাছে পোঁ ছে গিয়েছিল। তাই তারা পত্র পেয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন।

এছাড়া আফ্রিকার বর্বর জাতিও তার পত্র পেয়ে ইসলামে দীক্ষিত হয়। এভাবে তিনি অমু সলিমদের মাঝে ইসলাম প্রচারের অনেক কার্যকরী পদক্ষেপ ও যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

অপরাধের শ্রেণী বিভাগ ও কারা সংস্কার

তিনি শরীয়ত বিরোধী ও শরীয়ত সমর্থিত নয় এমন সব শাস্তি মওকু ফ করে দেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদেরকে শরীয়তের দণ্ড ছাড়া অন্য কোনও দণ্ড দিতে নিষেধ করেন এবং দৈহিক নির্যাতন বন্ধ করতে কঠোর নির্দেশ দেন। শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার করতে নিষেধ করেন। (তাবাকাত ৫/১৬২)

তিনি কারাগারেও উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করেন। কারাগারের সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার কু ঠু রীর পরিবর্তে প্রশস্ত, উন্মু ক্ত ও পরিচ্ছন্ন কক্ষ নির্মাণ করেন এবং কয়েদীদের জন্য ব্যাপক সু যোগ সু বিধার ইন্তেজাম করেন। ইমাম আবু ইউসু ফ রহ. তার *কিতাবু ল খারাজ* এ উমর ইবনে আব্দু ল আযীয রহ. এর একটি ফরমান উল্লেখ করেছেন যাতে কয়েদীদের জন্য **১৩**টির মত সু যোগ সু বিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল,

(১) কয়েদীদের উপর নির্যাতন করা যাবে না।

(২) তারা রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) মু সলিম কয়েদীদের এমন বেড়ী পরাবে না যাতে দাঁ ড়িয়ে নামায পড়তে কষ্ট হয়।

(৪) রাত্রিবেলা বেড়ী ও হাতকড়া খু লে দিবে যাতে তারা ভালোভাবে বিশ্রাম নিতে পারে।

(৫) প্রত্যেক কয়েদীকে তার প্রয়োজন অনু পাতে ভাতা দিতে হবে এবং তা প্রতিমাসে নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে।

ইলম ও সু ন্নাহ পু নর্জীবনে তার ভূ মিকা

যেহেতু তখনও পর্যন্ত হাদীসসমূ হ সু বিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়নি। এজন্য তিনি হাদীসসমূ হ সংরক্ষণ ও সংকলনের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনু ভব করলেন। তাই মদীনার গভর্ণর প্রখ্যাত আলেম আবু বকর ইবনে হাযমকে এই মর্মে ফরমান লিখে পাঠালেন,

انظر ماكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء.

'হযরত মু হাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোনও হাদীস পাওয়ামাত্রই তা লিপিবদ্ধ করুন। কেননা আমি এর অন্তর্ধান ও আলিমদের বিদায়ের আশঙ্কা করছি।'

এছাড়াও তিনি এ বিষয়ে সাম্রাজ্যের সকল আমলা ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামের দৃ ষ্টি আকর্ষণ করেন। বিশেষ করে উমরাহ বিনতে আব্দু র রহমান, কাসিম ইবেন মু হাম্মদ ইবনে আবু বকর বিশিষ্ট মু হাদ্দিস ইমাম যু হরিকে এই মহান কাজে নিযু ক্ত করেন। ইমাম যু হরী বড় বড় হাদীস গ্রন্থ রচনা করে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। তিনি শুধু হাদীস সংকলনের নির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি, হাদীস শিক্ষাদানেরও ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আলেম, মু হাদ্দিসগণকে নির্দেশ দেন তারা যেন মসজিদে মসজিদে হাদীস শিক্ষা দান করেন এবং তারা যাতে নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে শিক্ষাদানে নিরত থাকতে

পারেন এজন্য তাদের মাথাপিছু ১০০ দীনার ভাতার ব্যবস্থা করেন।

মৃ তু ্য

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. লিখেছেন, ভবিষ্যত-খলীফা ইয়াযীদ ইবনে আব্দু ল মালিক ষড়যন্ত্রমূ লকভাবে বিষপান করিয়ে তাকে হত্যা করে। উমর ইবনে আব্দু ল আযীয রহ. এর এক খাদিমকে এক হাজার দীনারের বিনিময়ে এই কাজে নিযু ক্ত করা হয়। বিষক্রিয়ায় তিনি অসু স্থ হয়ে পড়েন। ক্রমাগত বিশদিন রোগাক্রান্ত থাকার পর তিনি ১০১ হিজরীর রজব মাসের শেষ দশকের কোন এক শুক্রবার রাতের প্রথম ভাগে ৩৯ বছর এক মাস বা ৪০ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে চিরসজীব রাখু ন। আমীন॥

লেখক :
বিভাগীয় প্রধান, উচ্চতর হাদীস গবেষণা অনু ষদ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

হা রা নো ঐ তি হ্য

ইলমের রাজধানী স্পেন ও উলামায়ে আন্দালু স

মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী

ائے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھکو #تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا

‘হে আন্দালু সের পু ষ্পোদ্যান! মনে কি পড়ে,

তোমার বৃ ক্ষ-শাখে একদা আমরা নীড় বেঁ ধেছিলাম!’ -আল্লামা ইকবাল।

স্পেন। ইসলামের ইতিহাসে ‘আন্দালু স’ নামে পরিচিত। লোকমু খে ‘উন্দু লু স’ বা ‘আন্দু লু স’ প্রচলিত থাকলেও শব্দটির আসল উচ্চারণ ‘আন্দালু স’। (তারীখে আন্দালু স ১/৫) স্পেনের উলামায়ে কেরামের নামের সাথে কখনও ‘আন্দালু সী’ কখনও কু রতু বী, ইশবীলী, গারনাতী আবার কখনও ‘মাগরিবী’ শব্দ যোগ করা হয়। মু সলমানদের স্পেন বিজয় ও পতনের আলোচনা ব্যাপকভাবে হলেও স্পেনের ইলমী ঐতিহ্যের আলোচনা নেই বললেই চলে। এ বিষয়ে সামান্য কিছু জানাতে হলেও বড় কলেবরের গ্রন্থ রচনা প্রয়োজন। এখানে অতি সংক্ষেপে উলামায়ে স্পেন ও তাদের গৌরবোজ্জ্বল কিছু দীনী

স্পেনের ইতিকথা : প্রায় চারদিক সাগরবেষ্টিত ত্রিভূ জ আকৃ তির ইউরোপীয় একটি দ্বীপ-রাষ্ট্র স্পেন। পূ র্ব-দক্ষিণে ভূ মধ্য সাগর, পশ্চিম-উত্তরে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি। দক্ষিণ ভূ মধ্য সাগরের এপারে মু সলিম ভূ খণ্ড– উত্তর আফ্রিকা (মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, লিবিয়া)।

বর্ণিত আছে, হযরত নূ হ আ. এর মহাপ্লাবনের পর বনু তু বাল ইবনে ইয়াফেস ইবনে নূ হ এর ‘আন্দালু শ’ নামক এক অগ্নিপূ জারী জাতি সর্বপ্রথম এই ভূ খণ্ডে বসতি স্থাপন করে। তাদের নামানু সারে এলাকার নাম হয়ে যায় ‘আন্দালু শ’। পরে আরবরা ‘শীন’ কে ‘সীন’ দ্বারা পরিবর্তন করে ‘আন্দালু স’ বলতে শুরু করে। দীর্ঘদিন অনাবৃ ষ্টির কারণে সেখানকার নদী-নালা সব শুকিয়ে গেলে গোটা দেশ বসতিশূ ন্য হয়ে যায়। দীর্ঘ একশত বছর পর আফ্রিকান এক জাতি সেখানে গিয়ে পু নরায় বসবাস শুরু করে। দেড়শত বছর পর্যন্ত চলে তাদের একচ্ছত্র রাজত্ব। এরপর ‘ইশবান’ নামক এক রোমান বাদশাহ রাজত্ব দখল করে। তার নামানু সারে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত ‘ইশবীলিয়া’ নগরী। পরে এ নামেই সমগ্র দেশের নামকরণ করা হয়, যা পরবর্তীতে ‘ইশবীনিয়া’ নাম ধারণ করে। আর এই নামেরই বিকৃ তরূপ ‘হিস্পানিয়া’ সর্বশেষে ‘স্পেন’। (নফহাতু ত তীব ১/১০২)

অতঃপর পর্যায়ক্রমে এই এলাকার নেতৃ ত্ব আসে ‘তলেকা’ ও ‘বু শতারলিকদের’ হাতে। তারপর দু নিয়াতে আবির্ভূ ত হন হযরত ঈসা আ.। কিছু দিনের মধ্যে তঁ ার অনু সারীগণ (হাওয়ারিয়্যীন) সেখানে পেঁ ৗছে যান। তখন থেকে শুরু হয় খ্রিস্টানদের আধিপত্য। সর্বশেষ স্পেনের রাজত্ব ছিল ‘কু তী’ খ্রিস্টানদের হাতে। তাদেরই দশম রাজা ছিল ‘রডারিক’ বা ‘লাযরীক’ যে মু সলমানদের কাছে পরাজিত হয়। (আল বয়ানু ল মু গরিব ১/১৩৯)

স্পেনের আকাশে কালিমার পতাকা : উমাইয়া খলীফা ওয়ালিদ ইবনে আব্দু ল মালিকের শাসনামলে সেনাপতি মু সা বিন নু সাইরের নেতৃ ত্বে উত্তর আফ্রিকা মু সলমানদের অধিকারে চলে আসে। ৯১ হিজরীতে মু সা বিন নু সাইর খলীফার অনু মতিক্রমে তারেক বিন যিয়াদের নেতৃ ত্বে সাত হাজার মু জাহিদের এক জানবায কাফেলা ভূ মধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনে প্রবেশ করেন। ৯২ হিজরীতে মূ সা বিন নু সাইর আরো পঁ াচ হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেনে পেঁ ৗছেন। একে একে সব শহর মু সলমানদের হস্তগত হয়। গোড়াপত্তন হয় ইসলামী সাম্রাজ্যের।

ইলমের রাজধানী স্পেন : স্পেনে মু সলমানদের শাসনামল ছিল ইংরেজি বর্ষ হিসেবে (৭১১ খ্রি. থেকে ১৪৯২ খ্রি.) ৭৮১ বছর। আর হিজরী হিসেবে (৯১ হি. থেকে ৮৯৩ হি.) ৮০২ বছর। শুধু মু সলিম সাম্রাজ্যই নয় ইলমেরও রাজধানী ছিল স্পেন। হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, তাসাওউফসহ ইলমের প্রতিটি শাস্ত্র ও শাখার বড় বড় ইমাম ছিলেন স্পেনে। যারা বিভিন্ন বিষয়ের বড় বড় অসংখ্য কিতাব লিখেছেন। ইলমী জগতের এক বিশাল অঞ্চল উলামায়ে স্পেনের দখলে। যাদেরকে বাদ দিলে ইলমের এক বড় অধ্যায় বাদ পড়ে যাবে। উলামায়ে কেরামের পদচারণায় স্পেন পৃ থিবীর সর্বাধিক উন্নত ভূ খণ্ডে পরিণত হয়। এখানকার শিক্ষাকেন্দ্রসমূ হ সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইউরোপের রাজপরিবারের লোকেরা পর্যন্ত এখানে শিক্ষালাভ করাকে গৌরবের বিষয় মনে করত। শুধু কু রতু বা (কর্ডোভা) শহরে ছয় লাখ গ্রন্থের বিশাল লাইব্রেরী ছিল। যা ছিল তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থাগার। স্পেনের মু সলমানদের জ্ঞানানু রাগের ফলে ইউরোপে জ্ঞানচর্চার দ্বার খোলে। বর্তমান ইউরোপ এমন কোন বিস্ময়কর বস্তু পেশ করতে পারবে না যার পেছনে স্পেনের মু সলমানদের অবদান নেই। এ রচনায় আমরা স্পেনের সর্বাধিক পরিচিত ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন আলেমের পরিচিতি পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

স্পেনে সর্বপ্রথম হাদীসের দরস : ইমাম বাকী ইবনে মাখলাদ আন্দালু সী রহ. (জন্ম ২০১ হি., মৃ তু ্য ২৭৬ হি.) বিশ্বনন্দিত মু হাদ্দিস। হাদীসের বিখ্যাত দু ’টি কিতাব লিখেছেন, ‘*মু সনাদ*’ ও ‘*মু সান্নাফ*’। তিনিই স্পেনে সর্বপ্রথম হাদীসের দরস চালু করেন। তাকে স্পেনে উলূ মে শরঈয়্যাহর স্থপতি বলা চলে। ইমাম ইয়াকু ব ইবনে হুমাইদ ইবনে কাসেব (মৃ তু ্য ২৪০ হি.) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. (মৃ তু ্য ২৪১ হি.) এর ছাত্র। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর উপর যখন দরস দানের নিষেধাজ্ঞা ছিল তখন বাকী ইবনে মাখলাদ রহ. ভিখারীর বেশে এসে

প্রতিদিন একটি করে হাদীস শুনে যেতেন। তিনি ছিলেন ইমাম বু খারী (মৃ তু য ২৫৬ হি.), ইমাম ইবনে মাজাহ (মৃ তু য ২৭৫ হি.) ও আব্দু ল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. (মৃ তু য ২৯০ হি.) এর সহপাঠী। তিনি মু সতাজাবু দ্দাওয়াহ (যার দু 'আ কবু ল হয়) ছিলেন। একদা এক কয়েদীর জন্য তার মা দু 'আ চাইলে তিনি ঠোঁ াট নাড়তে আরম্ভ করতেই কয়েদীর হাতকড়া খু লে গেল। বারবার এরূপ হলে তাকে মু ক্তি দেয়া হয়। স্পেনের অলি-গলিতে তার ছাত্র ও গুণগ্রাহী ভরপু র ছিল। চতু র্দিকে অসংখ্য মসজিদ মাদরাসা। ইসলামী সভ্যতার এই নূ রানী পরিবেশ দেখে তিনি দৃ ঢ়তার সাথে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন,

لقد غرست لهم فى الأندلس غرسا لايقلع الا بخروج الدجال.

'আমি স্পেনে যে বীজ বপন করে গেলাম দাজ্জালের আবির্ভাব ছাড়া এর মূ লোৎপাটন সম্ভব নয়।' অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকবে। (সিয়ারু আ'লামিন নু বালা ১০/৬২১)

কিন্তু হায়! মু সলমানদের নৈতিক অধঃপতনের ফলে তার মাত্র ছয়শ বছর পরই স্পেন মু সলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

হাদীস শাস্ত্রে উলামায়ে স্পেন :

প্রখ্যাত মু হাদ্দিস আব্দু ল আযীয ইবনে আব্দু ল মালিক আন্দালু সী রহ. (মৃ তু য ৩৬৫ হি.) হাদীস সংগ্রহের জন্য যারা গোটা বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন তিনি তাদের অন্যতম। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার ছাত্র তার দরসে ছু টে আসত।

হাফেযে হাদীস আল্লামা ইবনে আব্দু ল বার রহ. (জন্ম ৩৬৮ হি. মৃ তু য ৪৬৩ হি.) ইলমের প্রাণকেন্দ্র কু রতু বায় (কর্ডোভায়) জন্মগ্রহণ করেন। সর্বজনস্বীকৃ ত যু গশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও হাদীস বিশারদ। 'হাফেযু ল মাগরিব' নামেও তিনি পরিচিত। প্রথমে তিনি জাহেরী মতাদর্শের ছিলেন পরে মালেকী মাযহাবে ফিরে আসেন। *মু আত্তা মালেক* এর জগদ্বিখ্যাত দু 'টি ব্যাখ্যাগ্রন্থ *আত-তামহীদ* ও *আল-ইসতিযকার* তারই লেখা। সাহাবায়ে কেরামের জীবনীর উপর তিনি কিতাব লিখেছেন *আল-ইসতি'আব* নামে। এতে ৩৬৫৯ জন সাহাবীর জীবনী স্থান পেয়েছে। সর্বজন সমাদৃ ত আরেকটি কিতাব লিখেছেন *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী*। শেষ জীবনে তিনি প্রধান বিচারকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

মু হাম্মাদ ইবনে ফু তু হ আল হুমাইদী আন্দালু সী (জন্ম ৪২০ হি. মৃ তু য ৪৮৮ হি.) স্পেনের কু রতু বা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য মিশর, দামেস্ক, বাগদাদ, মক্কা প্রভৃ তি শহরে সফর করেন। স্বীয় যু গের শ্রেষ্ঠ মু হাদ্দিস ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। যথা, *আল-জামউ বাইনাস সহীহাইন* এই কিতাবে তিনি *সহীহ বু খারী* ও *সহীহ মু সলিম* এর রেওয়ায়েতসমূ হকে একত্রিত করেছেন। *জাযওয়াতু ল মু কতাবাস* স্পেনের ইতিহাসের উপর এক অনবদ্য গ্রন্থ। *আদাবু ল আসদিকা, যম্মু ন নামীমা* ইত্যাদি আরো অনেক মূ ল্যবান কিতাব রয়েছে তার।

তিনি বিখ্যাত কবি ছিলেন। এই ঐতিহাসিক চরণটি তার রচিত,

كل من قال فى الصحابة سوءا # فاتهمه فى نفسه وابيه.

'যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মন্দ কথা বলে তু মি তার বংশ পরিচয়ের ব্যাপারে সন্দিহান থেকো।' (ওয়াফাইয়াতু ল আ'ইয়ান ৪/২৮২)

ইমাম রযীন ইবনে মু 'আবিয়া আন্দালু সী (মৃ তু য ৫৩৫ হি.) কালজয়ী মু হাদ্দিস, স্পেনের এই কৃ তিসন্তান দীর্ঘ এক যু গ মক্কায় অবস্থান করে বড় বড় শাইখদের থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। মক্কায় মালেকী মাযহাবের ইমাম হিসেবে দরস দিতেন। এ সময় আল্লামা ইবনে আসাকির, তবারী, ইবনে কু দামার ন্যায় জগদ্বরেণ্য মনীষীগণ তার দরসে বসতেন। তিনি হাদীসের জগতে যু গান্তকরী দু 'টি কিতাব সংকলন করেছেন। এক. *আত-তাজরীদ ফিল জাম্‌ই বাইনাস সিহাহিস সিত্তাহ*। প্রথম সারির ছয় কিতাবের সকল হাদীস সনদ ব্যতীত একত্রিত করেছেন। দু ই. *জামিউল মাসানীদ*। সহজে উপকৃ ত হওয়ার জন্য এই কিতাবে তিনি প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবসহ *মু সনাদে আহমাদ, মু সনাদে বায্‌যার, মু সনাদে কাবীর* ও *মু সনাদে আবী ইয়া'লা* এই দশ কিতাবের লক্ষাধিক হাদীস একত্র করে দিয়েছেন। কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য এই এক কিতাবই যথেষ্ট। এছাড়াও তার আরো অনেক কিতাব রয়েছে।

ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর আন্দালু সী (মৃ তু য ২৩৫ হি.) বিখ্যাত হাদীস সংকলক ও মালেকী মাযহাবের মু খপাত্র ছিলেন। *মু আত্তা মালেক* কিতাবের অনেক ধরনের সংকলন রয়েছে। তন্মধ্যে তার সংকলন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। (لموطا مالك روايات كثيرة واحسنها واشهرها رواية يحيى بن يحيى هذا)

হাফেযে হাদীস কাযী ইয়ায ইবনে মূ সা আন্দালু সী (জন্ম ৪৭৬ হি. মৃ তু য ৫৪৪ হি.) স্পেনের উপকূ লীয় শহর 'সাবতা'য় জন্মগ্রহণ করেন। দু নিয়াজোড়া পরিচিত ব্যক্তিত্ব। তার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে, لو لا عياض ما ذكر المغرب (কাযী ইয়ায না থাকলে আলোচনায়ই আসতো না স্পেন)। তিনি ইলমের সকল শাস্ত্রেই পারদর্শী ছিলেন এবং সকল বিষয়ে কিতাব লিখেছেন। *আশ-শিফা* তার বিশ্ববিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ। উলূ মু ল হাদীস বিষয়ে অতু লনীয় কিতাব *আল-ইলমা*। তিনি হাদীসের অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থও রচনা করেছেন। তার মধ্যে *মাশারিকু ল আনওয়ার, ইকমালু ল মু 'লিম শরহু মু সলিম* সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাফেযে হাদীস ইবনু সাইয়িদিন নাস আন্দালু সী (মৃ তু য ৬৫৯ হি.) 'খতীবে তিউনিসিয়া' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হাজার হাজার মানু ষ তার থেকে হাদীস শিখতে ভীড় জমাত। ইন্তিকালের পর তার স্থলাভিষিক্ত হন তার দৌহিত্র **হাফেযে হাদীস আবু ল ফাতাহ আন্দালু সী** (মৃ তু য ৭৩৪ হি.)। তিনি ছিলেন দাদার প্রতিচ্ছবি। তার দরসেও লোকেরা ভীড় করত।

ইবনু ল মু যায়্যিন আন্দালু সী (জন্ম ৫৭৮ হি. মৃ তু য ৬৫৬ হি.) কু রতু বা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মালেকী মাযহাবের বড় ইমাম, ফকীহ ও মু হাদ্দিস ছিলেন। হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থসহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূ র্ণ অনেক কিতাব লিখেছেন। তন্মধ্যে এক. *আল-মু ফহিম* যা *সহীহ মু সলিম* এর বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। ইমাম নববী রহ. তার *শরহুল মু সলিম* লেখার সময় এই কিতাবকে সামনে রেখেছেন। দু ই. *তালখীসু সহীহি মু সলিম*, তিন. *মু খতাসারুল বু খারী*, চার. *আল-ই'লাম*, পাঁ াচ. *শরহুত তালকীন*।

তাফসীর শাস্ত্র : তাফসীর শাস্ত্রেও উলামায়ে স্পেন অনেক কিতাব রচনা করেছেন। তার মধ্যে প্রসিদ্ধতম দু'টি কিতাব হচ্ছে, *তাফসীরে কুরতুবী* ও *আল-বাহরুল মুহীত*।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ কুরতুবী আন্দালুসী (মৃত্যু ৬৭১ হি.) তার নামেই ইলমের প্রাণকেন্দ্র 'কুরতুবা' শহর সকলের কাছে পরিচিত। তিনি ছিলেন বিশ্ববরেণ্য মুফাস্সির, ফকীহ, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও রিজাল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। *জামিউ আহকামিল কুরআন* নামে ১২ খণ্ডের বিশাল তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা *তাফসীরে কুরতুবী* নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত কিতাবে তিনি ফিকহী আলোচনার পাশাপাশি ৬৫০০ এরও অধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় স্থানে সনদের মান নিয়েও আলোচনা করেছেন। যে কারণে উক্ত কিতাবটি সর্বজন গৃহিত। এ ছাড়াও তিনি অন্যান্য বিষয়ে আরও অনেক কিতাব লিখেছেন।

ইমাম ইবনে হাইয়ান আল গারনাতী (মৃত্যু ৭৪৫ হি.) মূল নাম মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ইবনে হাইয়ান। স্পেনে মুসলমানদের সর্বশেষ ঘাঁটি ছিল 'গ্রানাডা'। ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দে রাজা ফার্ডিনান্ড তাও দখল করে নেয়। সেই ঐতিহাসিক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাফসীর, হাদীস, ইতিহাস ও আরবী সাহিত্য বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪৫০ জন বড় বড় শাইখদের থেকে তিনি হাদীস শিখেছেন। তিনি সর্বদা দরস, ইবাদত কিংবা লেখা-লেখিতে ব্যস্ত থাকতেন। এর বাইরে কোন সময় কাটাতেন না।

আল-বাহরুল মুহীত আট খণ্ডের এই অনুপম তাফসীর গ্রন্থ তার কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। আরবী সাহিত্যে তার বিখ্যাত কিতাব হচ্ছে *আল-মুবদী*। কিরাআত শাস্ত্রে লিখেছেন *ইকদুল লাআলী*।

ফিক্হ শাস্ত্র : উলামায়ে স্পেন মালেকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। হিজরী নবম শতাব্দীতে কুরতুবায় শাফেয়ী মাযহাব বিস্তার লাভ করে। বড় বড় অনেক ফকীহও ছিলেন স্পেনে। তাদের মধ্যে ইবনে আব্দুল বার, কাযী ইয়ায, ইবনুল মুযায়্যিন, ইমাম কুরতুবী, ইবনুল হাইয়ান, হুমাইদী, কাযী ইবনুল আরাবী, কাযী মুনযির ইবনে সাঈদ, ইবনুস সাইয়িদিন নাস প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও আরো ছিলেন,

ইমাম ইবনে হাযাম যাহেরী আন্দালুসী (জন্ম ৩৮৪ হি. মৃত্যু ৪৫৬ হি.) ২৬ বছর পর্যন্ত আরবী সাহিত্য ও দর্শন নিয়ে গবেষণা করেন। একদা জানাযার ইমামতি করতে গিয়ে ভুল করলে বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত হন। এ ঘটনায় মারত্মকভাবে ব্যথিত হয়ে তিনি ফিক্হ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। শুরুতে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরে যাহেরী মতাদর্শে প্রত্যাবর্তন করেন। তার লিখিত বিখ্যাত কিতাব *আল-মুহাল্লা বিল আছার*।

ফকীহ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া লাইছী (মৃত্যু ২৩৫ হি.) মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম, সরাসরি ইমাম মালেক রহ. এর ছাত্র। একদিন তিনি ইমাম মালেক রহ. এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। রাস্তা দিয়ে একটি হাতি যাচ্ছিল। উপস্থিত সবাই দরস থেকে বের হয়ে হাতি দেখতে গেল। কিন্তু তিনি বের হলেন না। ইমাম মালেক রহ. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যাচ্ছো না কেন? তোমাদের দেশে তো হাতি নেই! তিনি উত্তর দিলেন, আমি এত দূর থেকে কষ্ট করে এসেছি শুধু আপনাকে দেখার জন্য; হাতি দেখতে নয়। এ কথা শুনে ইমাম মালেক রহ. বললেন, 'তুমি স্পেনের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি'। উস্তাদের এ কথা তার জীবনে ফলেও ছিল। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন স্পেনের 'প্রধান মুফতী'। তার মাধ্যমে মালেকী মাযহাব সম্প্রসারিত হয়।

জগদ্বিখ্যাত ফকীহ ইবনে সায়্যিদিন নাস আন্দালুসী (জন্ম ৬৭১ হি. মৃত্যু ৭৩৪ হি.) তার মূল নাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ। 'সাইয়িদুন নাস' ইমাম শাফেঈ রহ. এর উপাধি। আর তিনি শাফেঈ রহ. এর সপ্তম বংশধর। তাই 'ইবনে সাইয়িদিন নাস' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শাফেয়ী মাযহাবের বড় ফকীহ, হাফেযে হাদীস, আদীব ও রিজাল শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন তিনি। মহামূল্যবান অনেক রচনাবলী রয়েছে তার। তন্মধ্যে *উয়ূনুল আছর, নুরুল উয়ূন* ও *শরহে তিরমিযী* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বনন্দিত ফকীহ কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী ইশবীলী (মৃত্যু ৫৪৩ হি.) স্পেনের উপকূলীয় ইশবীলিয়া শহরের অধিবাসী। মালেকী মাযহাবের বড় ফকীহ ছিলেন। ইমাম গাজালী রহ. এর কাছে ফিকহ পড়েছেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও সকল শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কিতাব লিখেছেন। *তিরমিযী শরীফ* এর বিখ্যাত শরাহ *আরেযাতুল আহওয়াযী* আজও তার কৃতিত্বের পরিচয় বহন করছে। তিনি কিছুদিন ইশবীলিয়ায় কাযীর দায়িত্বও পালন করেন।

রিজাল শাস্ত্র : এই শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ অনেক উলামায়ে কেরাম ছিলেন স্পেনে। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেন,

হাফেযে আন্দালুস কাসেম ইবনে আসবাগ (জন্ম ২৪৪ হি. মৃত্যু ৩৪০ হি.) কুরতুবা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম বাকী ইবনে মাখলাদ ও ইবনে কুতাইবা রহ. এর অন্যতম ছাত্র, জরাহ-তা'দীলের অন্যতম ইমাম।

আব্দুল্লাহ আল বাযী আন্দালুসী (মৃত্যু ৬৩৫ হি.) স্পেনের 'বাজা' নামক স্থানে জন্ম। পরবর্তীতে ইশবীলিয়ায় বসবাস শুরু করেন ও সেখানকার প্রধান বিচারকের দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। হজ্জ থেকে ফেরার পথে তিনি মিশরে অবস্থান করেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। এ ছাড়াও এই শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ অন্যান্য ব্যক্তিগণ হলেন আহমাদ আল-বাযী, কাসেম ইবনে সা'দান, খালাফ ইবনে কাসেম, মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ, আবু বকর ইবনে আতিয়্যাহ, আবু বকর ইবনে হায়দারা, আব্দুর রহমান ইবনে হুবাইশ প্রমুখ।

ইতিহাস শাস্ত্র : প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ **আল্লামা ইবনে বাশকুয়াল** (জন্ম ৪৯৪ হি. মৃত্যু ৫৭৮ হি.) খালাফ ইবনে আব্দুল মালেক। তার পঞ্চম পূর্বপুরুষ হচ্ছেন 'বাশকুয়াল'। তাই ইবনে বাশকুয়াল নামে প্রসিদ্ধ। কাযী ইবনুল আরাবী রহ. এর ছাত্র। তার নায়েব হিসেবে ইশবীলিয়ায় কিছুদিন কাযীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন হাফেযে হাদীস ও ইতিহাসবিদ। তিনি স্পেনের ইতিহাস সম্পর্কে বিখ্যাত এক কিতাব রচনা করেছেন *কিতাবুস সিলাহ* নামে। আরো বিভিন্ন বিষয়ে পঞ্চাশটির মত

কিতাব লিখেছেন। ৮৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাকে কু রতু বার কবরস্থানে দাফন করা হয়।

কালজয়ী ইতিহাস প্রণেতা আল্লামা ইবনে খালদু ন (জন্ম ৭৩২ হি. মৃ তু ্য ৮০৮ হি.) মূ ল নাম আব্দু র রহমান ইবনে মু হাম্মাদ আল-মাগরিবী। খালদু ন তার দশম পূ র্বপু রুষ। ইশবীলিয়া শহরের বংশোদ্ভূ ত। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে তার পূ র্বপু রুষগণ তিউনিসিয়ায় স্থানান্তরিত হন। তিনি বিখ্যাত সাহাবী হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাযি. এর বংশধর। তিউনিসিয়াতে জন্ম হলেও তিনি স্পেনের উলামায়ে কেরাম থেকে ইলম অর্জন করেছেন। স্ত্রী-সন্তানদেরকে শ্বশুরবাড়ী কু সতু নতু নিয়ায় পাঠিয়ে তিনি স্পেনে চলে যান। তার লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ *তারীখে ইবনে খালদু ন* এক বিশ্বখ্যাত সংকলন।

মু য়ার্‌রিখু ল আন্দালু স আল্লামা আবু হাইয়ান রহ. পূ র্বে তার আলোচনা করা হয়েছে। তিনিও স্পেনের বড় ইতিহাসবিদ। তিনি স্পেনের বিশিষ্টজনদের জীবনী সংকলন করেছেন কিতাবের নাম *আল-মু কতাবাস মিন আবনাইল আন্দালু স*।

ইতিহাসবিদ ইবনে বাস্‌সাম আন্দালু সী দ্বীপরাষ্ট্র স্পেনের ইতিহাস লিখেছেন *আয-যখীরা ফী মাহাসিনি আহলিল জাযীরা* নামে।

আবু নসর আল-ইশবীলী আন্দালু সী স্পেনীয়দের জীবনী সংক্রান্ত বিখ্যাত কিতাব লিখেছেন *মাতমাহুল আনফু স* নামে।

আরবী ভাষা ও সাহিত্য : কাযী মু নযির ইবনে সাঈদ আন্দালু সী (মৃ তু ্য ৩৫৫ হি.) শাহী মসজিদের খতীব ছিলেন। তার অলংকারপূ র্ণ বক্তৃ তামালাকে স্পেনের আরবী সাহিত্যের অনেক বড় ভাণ্ডার মনে করা হয়। দাউদ যাহেরীর মাযহাবের ফকীহও ছিলেন তিনি। তবে কাযীর দায়িত্ব পালনকালে মালেকী মাযহাবানু সারে ফয়সালা দিতেন। কেননা সাধারণ মানু ষ সব মালেকী মাযহাবের অনু সারী ছিল।

স্পেনের আরেক জন বড় সাহিত্যিক ছিলেন, **আবু ল মু 'তারিফ আব্দু র রহমান ইবনে ফু তু হ আল-ইসফিরইয়ানী** কু রতু বার অধিবাসী ছিলেন।

দর্শন শাস্ত্র : আল্লামা ইবনে রুশদ কু রতু বী (মৃ তু ্য ৫৯৫ হি.) কু রতু বার বিখ্যাত আলেম, দর্শন শাস্ত্রের প্রবাদ পু রুষ। গ্রীক দর্শনের সকল গ্রন্থ তিনি আরবীতে অনু বাদ করেছিলেন। দার্শনিক হিসেবে তিনি অ্যারিস্টটলকেও অতিক্রম করেন। অনেক বিষয়ে তার সাথে মতবিরোধ করেছেন এবং নিজে অনেক কিছু সংযোজন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি মানতেক (তর্ক শাস্ত্র), চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব ও উদ্ভিদ বিদ্যাসহ বিভিন্ন বিষয়ে খু ব অভিজ্ঞ ছিলেন। এ সকল বিষয়ে অনেক কিতাব লিখেছেন। যথা, *নিহায়াতু ল মু জতাহিদ, কু ল্লিয়্যাতু ত তিব, কিতাবু ল হাইওয়ান* ইত্যাদি।

শাইখে তাসাওউফ : আবু আব্দু ল্লাহ আন্দালু সী (মৃ তু ্য ২৮৬ হি.) মু রশিদে কাবীর, আধ্যাত্মিক রাহবার, তাসাওউফ জগতের প্রবাদ পু রুষ। তিনি ছিলেন জু নায়েদ বাগদাদী রহ. এর ন্যায় হাজারো উলামায়ে কেরামের মু রশিদ। একদা সফরে যাচ্ছিলেন, পথে অমু সলিমদের কোন কার্যকলাপ দেখে তাদের প্রতি অন্তরে কিছু টা তাচ্ছিল্য ভাব পয়দা হয়েছিল। সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তার ভিতর থেকে ঈমানের নূ র ছিনিয়ে নেন। ভক্তবৃ ন্দের রোনাযারীর বরকতে তওবা নসীব হয়। তিনি ছাড়াও আরো অসংখ্য বড় বড় শাইখ ছিলেন স্পেনে।

উপরে বিভিন্ন শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ও ইমামের পরিচিতি পেশ করা হয়েছে। এ ছাড়াও আল্লামা শাতেবী, ইবনু ল খতীব, ইবনু ল ফাজ্জার, ইবনে মারযূ ক, আবু ল বারাকাত, বালকীনী তারা সকলেই গ্রানাডার মাদরাসার ছাত্র ছিলেন।

আফসোস! কোথায় আজ বাকী ইবনে মাখলাদের সেই আন্দালু স? কিভাবে বিলীন হয়ে গেল ইলমের রাজধানী? স্পেনে মু সলমানদের উত্থানের কারণ যেমন স্পষ্ট তাদের পতনের কারণও তেমনি স্পষ্ট। একদিকে মু সলমানরা পার্থিব ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, অপরদিকে উলামায়ে কেরামও ছিলেন নিজেদের পরিবেশে আবদ্ধ; জনসাধারণ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। দাওয়াতী মেহনত আর শাণিত তলোয়ারের যথাযথ ব্যবহার ব্যাপকভাবে না থাকায় দিন দিন মানু ষ ঈমান-আকীদা থেকে দূ রে সরতে থাকে আর হতে থাকে ভীরু বু যদিল। স্পেন থেকেই শুরু হয় প্রাচ্যবিদদের (ইস্‌তিশরাকের) ফিতনা। দলে দলে মানু ষ মু রতাদ হতে শুরু করে। মু সলিম শাসকগণও আরাম আয়েশে লিপ্ত। এ সু যোগে মু সলমানদের কঁ াধে চেপে বসে খ্রিস্টান রাজা ফার্ডিনান্ড ও রাণী ইসাবেলা।

১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল। নিরাপদ আশ্রয়ে পেঁ ৗছে দেয়ার কথা বলে সাত লাখ মু সলমানকে মসজিদে একত্রিত করে আগুনে পু ড়িয়ে এবং সাগরে ডু বিয়ে শহীদ করার পর রাজা বলেছিল, Oh Muslim! how fool you! 'হায় মু সলমান! তোমরা কত বোকা!' সেই থেকে তারা পালন করে আসছে 'এপ্রিল ফু ল' সংস্কৃ তি। আফসোস! আজ মু সলমান ছেলে-মেয়েরাও ১লা এপ্রিলে মানু ষকে ধেঁ াকা ও প্রতারণার মাধ্যমে বোকা বানিয়ে থাকে। অথচ ১লা এপ্রিল আমাদেরকে সেই মর্মান্তিক ট্রাজেডির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই মর্মান্তিক মু সলিম নিধনের অপসংস্কৃ তি বর্জন করতে সর্বমহলের সচেতন হওয়া দরকার। বিশেষ করে স্কু লপড়ুয়া কোমলমতি মু সলিম শিশুদের সামনে এ সংস্কৃ তির ইতিকথা তু লে ধরা আবশ্যক।

পরিশেষে : স্পেনের ন্যায় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃ হত্তম মু সলিম দেশ আমাদের এই বাংলাদেশেও রয়েছে হাজার হাজার ইলমী মারকায। লাখ লাখ আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখ। এদেশ থেকেও ইসলাম ও মু সলমানদেরকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য এন.জি.ও, খ্রিস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা দিন দিন বৃ দ্ধি পাচ্ছে। সামান্য অর্থের লোভে দলে দলে মানু ষ খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে। তাই এখনই আমাদেরকে সজাগ হতে হবে। শুধু মাদরাসা মসজিদ ও নিজের কর্মস্থলেই দীনী মেহনত সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। অমু সলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত ও মু সলমানদের মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের মাধ্যমে ঈমানী চেতনা জাগ্রত করতে হবে। রুখে দিতে হবে এন.জি.ও-মিশনারীদের সকল মিশন ও ষড়যন্ত্র। অন্যথায় আমাদেরকেও স্পেনের ভাগ্য বরণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে হেফাযত করুন। আমীন ॥

লেখক :

মু ঈনে দারুল ইফতা, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

....

রিয়াযু স সালিহীন (৩৯ পৃ ষ্ঠার পর)

আল্লামা মু হাম্মদ ইবনে আল্লান এর ৪ খণ্ডে সমাপ্ত এক সমৃ দ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। নাম *দলীলু ল ফালিহীন লিতু রুকি রিয়াযিস সালিহীন* যা দারু ইহইয়ায়িত তু রাসিল আরাবী থেকে ছেপেছে।

এই গ্রন্থের হাদীসগুলোর মান

আল্লামা নববী রহ. এই গ্রন্থ রচনায় সংকল্প করেছিলেন যে, এই গ্রন্থে তিনি কেবল সহীহ হাদীসই সংকলন করবেন। আলহামদু লিল্লাহ, কয়েকটি হাদীস ব্যতীত এক্ষেত্রে তিনি পূ র্ণ সফল হয়েছেন। প্রখ্যাত মু হাক্কিক শাইখ আব্দু ল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. বলেন,

اما كتبه النافع المعطار المشهور باسم "رياض الصالحين" فقد التزم فيه ان لابد ... إلا حديثا صحيحا كما صرح بذلك في مقدمته ... حافظ رحمه الله تعالى فيما يبدو على هذا الالتزام إلا انى وقفت مصادفة على ثلاثة احاديث هى من الحديث الضعيف على خلاف ما التزم.

'আল্লামা নববী রহ. তঁা র প্রসিদ্ধ ও অধিক উপকারী কিতাব 'রিয়াযু স সালিহীন' এর ভূ মিকায় কেবল সহীহ হাদীস সংকলন করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি পূ র্ণ মাত্রায় উতরে গেছেন তবে সতর্কতা সত্ত্বেও এতে তিনটি যঈফ রেওয়ায়েত স্থান পেয়েছে।

এর প্রথমটি হল, মু রাকাবা অধ্যায়ে, ... الكيس من دان نفسه (হা. ৬৬)। দ্বিতীয়টি হল, তাওকীরুল উলামা (উলামাদের সম্মান) অধ্যায়ে, ما اكرم شيخ شابا ... (হা. ৩৫৯)। তৃ তীয়টি হল, আদাবে শুরব (পান করার আদব) অধ্যায়ে, ... لاتشربو واحدا (হা. ৭০৮)। তবে এগুলোও আমলযোগ্য হাদীস।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ব্যাপক উপকারী কিতাবটি সংগ্রহ করার এবং এতে বর্ণিত হাদীসসমূ হের আলোকে পরকালীন পাথেয় সমৃ দ্ধ করার সৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন ॥

মাতৃজাতি

মায়ের মর্যাদা

মাওলানা মাহমূদুল আমীন

মায়ায় ভরপুর মধুর এক নাম 'মা'। শান্তির, স্বস্তির ও পরম নির্ভরতার এক ... 'মা'। ... ল আলামীন ... পরম সম্মানের আসনে সমাসীন করেছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে 'মা'কে মুহাব্বত করা দীনের অঙ্গ; তাঁর সাথে সাক্ষাত করা ইবাদত; তাঁর সামনে বিনম্র হওয়া রহমত; তাঁর তরে বিনয়ী হওয়া রফ'আত (মর্যাদা); তাঁর খিদমত করা বেহেশতের পথ এবং তাঁর পদতলে অনন্ত জান্নাত।'

ইসলাম মাকে মর্যাদার যে স্বর্ণ শিখরে অধিষ্ঠিত করেছে তা অনুধাবন করার জন্য বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। কুরআন ও হাদীসের শুধু শব্দের প্রতি লক্ষ্য করলেও এ সত্যটি জাজ্বল্যরূপে ফুটে উঠবে। মায়ের মর্যাদা সংবলিত বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীসের মধ্য হতে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো–

এক. মাতা-পিতা উভয়কেই আল্লাহ তা'আলা সুমহান মর্যাদা দান করেছেন। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...

অর্থ : আর তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে বিনয়ের বাহু নুইয়ে দাও এবং বল, হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল ২৩-২৪)

এ আয়াতসহ বেশ কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর হকের পরই মাতা-পিতার হক আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়, পিতা-মাতার অধিকার ও সম্মান কত বেশী।

দুই. মায়ের মর্যাদা ক্ষেত্রবিশেষে পিতার মর্যাদার চাইতেও বেশী। আল্লাহ তা'আলা
ইরশাদ করেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا...

অর্থ : আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছেন। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে ত্রিশ মাস সময় লেগেছে।... (সূরা আহকাফ-১৫)

এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা মুফতী শফী রহ. *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন* -এ 'মায়ের হক পিতা অপেক্ষা বেশী' শিরোনামের অধীনে লিখেছেন, পিতা-মাতার সেবা-যত্ন ও আনুগত্য জরুরী হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্য অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষতঃ মায়ের কষ্ট অনেক বেশী হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মায়ের কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এছাড়াও এ সময়ে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন ৮/১৬)

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেছেন,

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك

অর্থ : এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! সদ্ব্যবহারের সবচে' বেশী হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আবার জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কে? উত্তরে বললেন, তোমার মা। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কে? বললেন, তোমার মা। আবারো জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কে? বললেন, তোমার বাবা। (সহীহ বুখারী, হা. ৫৯৭১) এই হাদীসের আলোকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, মায়ের হক পিতার হকের তিনগুণ বেশী।

তিন. মা যদি অমুসলিমও হন তবুও তার সম্মান ও সহায়তা করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সৎভাবে সহাবস্থান করবে। (সূরা লুকমান-১৫)

হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. বর্ণনা করেন,

قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك

অর্থ : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় একদা আমার মা আমার কাছে এলেন, তখনও তিনি মুশরিক ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলাম, আমার মুশরিক মা আমার কাছে সহায়তা পেতে চান, আমি কি তাঁর সাথে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবো? (তার সহায়তা করবো?) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তুমি তোমার মায়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। (সহীহ বুখারী; হা. ২৬২০)

চার. মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্‌ত। হযরত মুআবিয়া ইবনে জাহিমা আস্‌ সালামী রাযি. থেকে বর্ণিত,

أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك فقال هل لك من أم قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها حسن صحيح

অর্থ : হযরত জাহিমা আস্‌সালামী রাযি. প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে যেতে

চাই। আর এজন্য আমি আপনার কাছে পরামর্শ করতে এসেছি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার মায়ের খিদমত করো; কেননা জান্নাত তাঁর পদযুগলের নীচে। (সুনানে নাসাঈ; হা. ৩১০৪)

পাঁচ. মায়ের মর্যাদা এত বেশী যে, মায়ের খিদমত করলে গুনাহ মাফ তো হয়ই, মায়ের অনুপস্থিতিতে খালার খিদমত করলেও আল্লাহ তা'আলা গুনাহ মাফ করে দেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন,

أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة قال هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها

অর্থ : এক ব্যক্তি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি মস্ত বড় এক গুনাহ করে ফেলেছি, আমার কি তওবার (গুনাহ মাফের) সুযোগ আছে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা জীবিত আছেন? সে বললো, না। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তোমার খালা কি জীবিত আছেন? সে বললো হ্যাঁ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তোমার খালার সাথে সদ্ব্যবহার করো। (সুনানে তিরমিযী; হা. ১৯০৪)

ছয়. মায়ের উঁচু মর্যাদা এই হাদীসের দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন দুধমাতার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন। হযরত আবুতুফাইল রাযি. বর্ণনা করেন,

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط لها رداءه، فجلست عليه، فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته

অর্থ : আমি দেখেছি, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিইররানাহ নামক স্থানে গোস্ত বণ্টন করছিলেন (আমি তখনো ছোট; উটের হাড় ইত্যাদি বহন করি)। এমন সময় এক বৃদ্ধা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। তৎক্ষণাৎ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাদর তাঁর জন্য বিছিয়ে দিলেন। সে বৃদ্ধা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদরের উপর বসলেন। (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাকে এত সম্মান করতে দেখে আমি বিস্মিত হয়ে) জিজ্ঞাসা করলাম 'ইনি কে?' লোকেরা উত্তর দিলো 'ইনি নবীজীর দুধমাতা (হালিমা সা'দিয়া)। (সুনানে আবু দাউদ; হা. ৫১৪৪)

সাত. মায়ের সেবাকারী সন্তানের দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন। হযরত উসাইর ইবনে জাবের রাযি. বর্ণনা করেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর কাছে যখন ইয়ামান থেকে কোনও কাফেলা আসতো তখন জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের মধ্যে কি উয়াইস ইবনে আমের আছেন? এভাবে উয়াইসকে খুঁজে বের করলেন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই কি উয়াইস ইবনে আমের?

: হ্যাঁ।

: তুমি কি মুরাদ কবিলার শাখা ক্বরান গোত্রের লোক?

: হ্যাঁ।

: তোমার দেহে কি শ্বেত রোগ ছিল? অতঃপর মাত্র এক দিরহাম পরিমাণ ব্যতীত অবশিষ্ট দেহের শ্বেত রোগ থেকে তুমি আরোগ্য লাভ করেছো?

: হ্যাঁ।

: তোমার মা কি জীবিত আছেন?

: হ্যাঁ।

এরপর উমর রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কাছে ইয়ামানী কাফেলার সাথে উয়াইস ইবনে আমের আসবে, মুরাদ কবিলার ক্বরান নামক শাখা গোত্র থেকে। যার শরীরে এক সময় শ্বেতরোগ ছিল। সে সময় সে তা থেকে সুস্থ হবে এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ব্যতীত। তাঁর মা জীবিত থাকবেন। সে তার মায়ের অনুগত হবে। যদি সে আল্লাহর কাছে শপথ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর শপথকে পূর্ণ করবেন। তুমি পারলে তার দ্বারা আল্লাহর দরবারে তোমার জন্য গুনাহ মাফের দু'আ করিও। হযরত উমর রাযি. তাঁকে বললেন, তুমি আমার জন্য দু'আ করো আল্লাহ তা'আলা যেন আমার গুনাহ মাফ করে দেন। অতঃপর উয়াইস ক্বরানী রহ. উমর রাযি. এর জন্য ইস্তিগফার করলেন। (সহীহ মুসলিম; হা. ৬৬৫৬)

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত উয়াইস ক্বরানী রহ. এর শপথ পূর্ণ হওয়ার এবং দু'আ কবুল হওয়ার কারণ এটাই ছিল যে, তিনি তার মায়ের সেবক ও অনুগত ছিলেন।

আট. মায়ের অবাধ্য হওয়া সন্তানের জন্য হারাম। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. বর্ণনা করেন,

قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য মায়ের অবাধ্যতাকে হারাম করে দিয়েছেন। (সহীহ বুখারী; হা. ২৪০৮)

নয়. মায়ের ঋণ শোধ করা অসম্ভব। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. ইয়ামানের এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে তার মাকে নিজের পিঠে চড়িয়ে কা'বা শরীফ তওয়াফ করছে আর বলছে, নিশ্চয়ই আমি আমার মায়ের অনুগত উট। যদিও উটকে ভয় দেখানো হয়; কিন্তু, আমাকে ভয় দেখানো হয় না। অতঃপর তিনি ইবনে উমর রাযি.কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ইবনে উমর! আমি কি আমার মায়ের প্রতিদান দিতে পেরেছি? তখন হযরত ইবনে উমর রাযি. বললেন, না; তুমি তোমার মায়ের সামান্য হকও আদায় করতে পারোনি। (আল আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী; হা. ১১)

এ সকল আয়াত ও হাদীসের আলোকে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইসলাম মাকে মর্যাদা ও সম্মানের শ্রেষ্ঠতম আসনে সমাসীন করেছে।

পশ্চিমা কালচার মায়ের মর্যাদার সৌধকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে

শুধু মাকে নয়; বরং গোটা মাতৃজাতিকেই ইসলাম লাঞ্ছনা,বঞ্চনা ও জুলুম-নির্যাতনের অতলগহ্বর থেকে উদ্ধার করে ইজ্জত ও সম্মানের রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছে। অপরদিকে আজ পশ্চিমা বিশ্বের নগ্ন সভ্যতা মাতৃজাতিকে আবারও সেই বেইজ্জতি ও অমানবিকতার অতলান্তে নিক্ষেপ করে চলেছে। ওরা নারী স্বাধীনতা ও মুক্তির চটকদার শ্লোগানে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে মাতৃজাতির মর্যাদার সৌধকে। ওরা তাদেরকে নিজেদের ভোগ্য পণ্যে

পরিণত করছে। ওদের ফ্রি সেক্সের কালচার মাতৃ   জাতিকে স্বস্তি ও শান্তির পারিবারিক বাঁ ধন থেকে বঞ্চিত করছে। ওরা পরিবার পরিকল্পনার নামে শুধু   নিয়ন্ত্রণ নয়; নিঃশেষ করে দিচ্ছে নারীর মা হওয়ার সক্ষমতাকে। মাতৃ বৈরী পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা বৃ   দ্ধা মাকে নির্দয়ভাবে ঠেলে দিচ্ছে বৃ   দ্ধাশ্রমে। ফলে হতভাগা মায়েরা সন্তান ও স্বজনদের সেবা-বঞ্চিত হয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জনের মাধ্যমে ইহজগত ত্যাগ করছে ধু ঁ কে ধু ঁ কে। বছরের একটি দিনকে 'মা দিবস' ঘোষণা করে নানা উপহার হাতে ওরা যখন বৃ   দ্ধাশ্রমে মায়ের সামনে হাজির হয় তখন যেন মায়ের বু কে বেদনার অঙ্গারগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। হৃদয়ের ক্ষতগুলো আবারো দগদগে তাজা হয়ে তা থেকে অবিরত রক্তক্ষরণ হতে থাকে। আফসোস! এর পরও ওরা নারী দরদী (?) আর ইসলাম নারী বিরোধী!

মা দিবসে একজন আধু   নিকা মায়ের আবেগময় রোজনামচা

আজ যে সকল আধু   নিক মা আপন কলিজার টু   করো সন্তানকে পশ্চিমা শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃ   তিতে গড়ে তু   লছেন তাদের অনেকেই এই শঙ্কায় ভু   গছেন যে, 'শেষ বয়সে তাদের ঠিকানাও হয়তো পশ্চিমা বিশ্বের মায়েদের ন্যায় বৃ   দ্ধাশ্রম হতে পারে।' এমনই একজন আধু   নিকা মায়ের আবেগঘন একটি রোজনামচা নিম্নে তু   লে ধরছি।

রাত ঠিক ১২.০১ মিনিটে এসে আমার সাত বছরের ছেলেটি আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, 'মা-জি! শুভ মা দিবস'। আমি যে মা! অনু   ভূ   তিটা যে কি বলতে পারবো না। এই প্রথমবার আমার ছেলে আমাকে বিশেষ দিন মা দিবসে শুভেচ্ছা জানালো।... কিন্তু মাঝে মাঝে ভয়ে বু   ক কেঁ   পে উঠে। বাবা তু   মি বড় হয়ে আমাকে বৃ   দ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিবে না তো? কে জানে দিতেও পারে। এখনই ভেবে কষ্ট পেয়ে কি লাভ, তাই না? আজ যে সন্তানের জন্য দিনকে রাত, রাতকে দিন করে খাটছি সেই সন্তান কি আমাকেও পাঠিয়ে দিবে ওর আদরযত্ন থেকে দূ   রে সরিয়ে। তাহলে কি পেলাম? কি দিলো আমার সন্তানটি আমাকে? আমি তো আমার মাকে পাঠাইনি। আমার স্বামীও তার মা'কে পাঠায়নি। তবে কি আমার ভাগ্যে জু   টবে সেই আশ্রয়, যেখানে থাকবে না আমার কাছের কেউ? আমার সন্তান, নাতি-নাতনী, বউ-ছেলে? 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত' –এই কথাটি ভু   ল নাকি মিথ্যা?

অনেক মা আছেন বৃ   দ্ধাশ্রমে, তাদের সন্তানেরাও হয়তো আজ তাদের শুভেচ্ছা জানাতে যাবে। কিন্তু আসলেই কি তারা তাদের মা'কে ভালোবাসে? ... (প্রথম আলো। ব্লগ থেকে সংগৃ   হিত)

উক্ত মা'সহ সকল আধু   নিক মায়েদেরকে বলবো 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত' কথাটি ভু   ল কিংবা মিথ্যা নয়। আমরাই বরং আমাদের সন্তানদেরকে 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত' কথাটির মর্ম শিক্ষা দেইনি। কু   রআন-হাদীসের আসমানী শিক্ষা না দিয়ে অতি কচি বয়স থেকেই তাদেরকে বিজাতীয় পঁ   তিগন্ধময় শিক্ষা ও সংস্কৃ   তিতে গড়ে তু   লছি। এভাবে বু   ড়ো বয়সে বৃ   দ্ধাশ্রমে যাওয়ার বন্দোবস্ত তো আমরা নিজেরাই করছি। সন্তানকে দোষ দিয়ে কী লাভ?

আল্লাহ তা'আলা মা'কে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। সু   তরাং যে সন্তানের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত ও ভয় আছে সে সন্তানই মা'কে যথাযথ মহব্বত ও সম্মান করবে। আল্লাহ তা'আলা সন্তানকে মাতা-পিতার জন্য যে রহমতের দু   'আ শিখিয়েছেন তা কিন্তু নিঃশর্ত নয়। দু   'আটির অর্থ হলো, 'হে প্রভু   ! আমার মাতা-পিতার প্রতি দয়া করুন যেমন তারা শৈশবে দয়া দিয়ে আমাকে লালন করেছে'। পশ্চিমা কালচারে প্রভাবিত যে মায়েরা আজ-কাল চাকরি-বাকরির কারণে কিংবা ফ্যাশন বশতঃ আয়া-বু   য়া দিয়ে সন্তানদের লালন করে বিনা কারণে সন্তানকে পূ   র্ণ মেয়াদ দু   গ্ধ দান থেকে বঞ্চিত করে ও সন্তানকে ঝামেলা মনে করত সংখ্যা সীমিত রাখে তাদের জন্য তাদের সন্তানেরা দু   'আ করলেও তারা প্রতিফল কতটু   কু   আশা করতে পারেন? তাই আসু   ন, আমরা পশ্চিমা কালচার বর্জন করি এবং সন্তানকে আল্লাহওয়ালারূপে গড়ে তু   লি।

তাহলে ইনশাআল্লাহ শুধু   বৃ   দ্ধ বয়সে নয়, পরকালেও অনন্ত অসীম সময়ের জন্য জান্নাতে সন্তানের সঙ্গ পাওয়া যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক :

পরিচালক, মা'হাদু   ল বু   হুসিল ইসলামিয়া। মু   দাররিস, জামি'আ ইসলামিয়া চরওয়াশপু   র। খতীব, আজিমপু   র পার্টি হাউজ কলোনি জামে মসজিদ।

সম্পাদকীয় (২ পৃ   ষ্ঠার পর)

কারও মু   খ ও শরীরের দু   র্গন্ধও যেন অন্যের কষ্টের কারণ না হয়। পরনারীর প্রতি আসক্তি তো দূ   রের কথা চোখ তু   লে তাকালেও পরকালে সে চোখে গলিত শিশা ঢালা হবে। ঘাম শুকানোর পূ   র্বেই শ্রমিকের মজু   রী দিয়ে দাও। নিজে   যা পরবে ও খাবে ক্রীতদাস-দাসীকে তাই পরাও ও খেতে দাও। যমীনবাসীর প্রতি দয়া কর তাহলে আসমানবাসী তোমার প্রতি দয়া করবেন। প্রতিবেশীকে অনাহারী রেখে পেট পু   রে আহার করো না। মানবিক অধিকারে সকলেই সমান। মু   সলিম দেশের সংখ্যালঘু   র জান-মাল মু   সলিম নাগরিকের মতই নিরাপদ। ধনীদের সম্পদে রয়েছে গরীবের নির্ধারিত অংশ, যা পরিশোধ না করলে তার সকল সম্পদ অপবিত্র ও অভিশপ্ত। সু   দের একটি টাকা নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচারের শামিল। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইসলাম ছাড়া অন্য কোনও ধর্মদর্শনে মানবতার এত খু ঁ   টিনাটি বিষয়ে এত গুরুত্ব দেয়ার নজির নেই। অন্য কোনও জাতি-ধর্মে মানবতা ও সভ্যতার ছিটেফোঁ   টা থাকলে তা মু   সলমানদের কাছ থেকেই ধার করে নেয়া। তাদের নিজস্ব ভাণ্ডার মানবতা ও সভ্যতা থেকে সম্পূ   র্ণ মু   ক্ত। অন্যথায় ইসলামপূ   র্ব যু   গে কিছু   টা হলেও তার দেখা মিলতো!

ইয়াহুদ নাসারা ও পৌত্তলিকদের ধোঁ   কায় পড়ে আত্মবিস্মৃ   ত মু   সলমানেরা নৈতিক অধঃপতনের চরমে পেঁ   ৗছেও কথিত সভ্যদের চেয়ে অনেক ভাল আছে। যার সাক্ষী নিপীড়িত যাযাবর তালেবানের হাতে বন্দি মহিলা সংবাদিক ও ত্রাণকর্মী; মু   ক্তির পর যারা ইসলামেই খুঁ   জে নিয়েছে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা। বর্তমানের মু   সলিম নামধারী দু   র্নীতিবাজ, জালিম, প্রতারক ও চরিত্রহীনেরা কেউ ইসলামের শিক্ষা পায়নি। এরা মূ   লতঃ বে-ঈমান পশুদের শিষ্য, তাদের পদলেহী কিংবা বর্ণচোরা মু   নাফিক। এদের প্রতি আঙ্গু   ল তু   লে

ইসলামকে মূল্যায়ন করা বিবেকের সাথে প্রতারণা। ইসলামকে সঠিকরূপে বুঝতে হলে বিশ্বসভ্যতার শিক্ষক সাহাবায়ে কেরাম, কল্যাণযুগের মহান ব্যক্তিবর্গ ও অদ্যাবধি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী আলেম উলামা ও তাদের সংস্পর্শধন্য দ্বীনদার সাধারণ মুসলমানদেরকে দেখতে হবে। আজও তাদের কাছে রয়েছে শিক্ষণীয় মানবতা, ঈর্ষণীয় সভ্যতা ও অনুপম ন্যায়-নিষ্ঠা।

কিছু আত্মপরিচয় বিস্মৃত মুসলমান বে-ঈমানদের মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে সমাধান পেতে ওদের কাছেই ধর্না দেয়; ভিক্ষার ঝুলি তুলে ধরে। এরা ইসলাম শিখে না, শিখলেও তা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের বই পড়ে কিংবা আলেমদের কাছে না গিয়ে নিজে নিজেই। তথাকথিত এসব স্কলারদের হাত কলসির তলায় পৌঁছে না। ফলে কলসির তলা নেই বলে মন্তব্য করে।

ও পথহারা পথিক! ও বল্গাহীন শিক্ষিত্! ইসলাম কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়! ইসলামে আছে তোমারও অধিকার। ইসলাম শিখো। ইসলামকে জানো। ইসলামের অপার সৌন্দর্য অবলোকন করো। তবে অবশ্যই আমলদার আলেমের সোহবতে গিয়ে। তাহলেই সন্ধান পাবে আপন ঐশ্বর্যের এবং ভেতরে-বাইরে মানুষও হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

এযুগের মাসাইল

শরয়ী বিধানে প্রাণীর ছবি

মাওলানা মাকসূদুর রহমান

প্রথমদিকে মানুষ তাদের সমাজের নেক ও সৎ লোকদের ভাস্কর্য বানাতো, চিত্র তৈরি করতো। কালক্রমে সেটাই তাদের পূজনীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ইমাম বুখারী রহ. قوله تعالى: ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق অধ্যায়ে ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন- 'ওয়াদ্দা', 'সুয়া'আ', 'ইয়াগুছ', 'ইয়াউক' মূলত নূহ সম্প্রদায়ের সৎ লোকদের নাম। তাদের মৃত্যুর পর তাদের নামে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য শয়তান নূহ সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করলো (যেন তাদের দেখে ইবাদতের কথা স্মরণ হয়) তারা তাই করল। যখন সৎ উদ্দেশ্যে ভাস্কর্য স্থাপনকারী এসব লোক দুনিয়া থেকে চলে গেল পরবর্তী প্রজন্ম মূল উদ্দেশ্য ভুলে গেল এবং এগুলোরই পূজা করা শুরু করে দিল। (বুখারী শরীফ; হা. ৪৯২০)

তাফসীরে তাবারীতে আছে, এরা হযরত নূহ আ. এর যুগেরও পূর্বে হযরত আদম আ. এর সন্তানদের মধ্য থেকে ছিল। তারা ছিল সৎ ও নেককার। তাদের মৃত্যুর পর অনুসারীরা ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির জন্য তাদের চিত্র তৈরি করে রাখার সিদ্ধান্ত নিল এবং তাই করল। যখন এই স্তরের সবাই দুনিয়া থেকে চলে গেল, শয়তান পরবর্তী প্রজন্মকে বোঝালো যে, পূর্ববর্তীরা এই ছবিগুলোরই ইবাদত করতো। তাদের ওসিলায় বৃষ্টি বর্ষিত হতো। (তোমরাও তাদের ইবাদত করো যাতে কল্যাণ লাভ করতে পারো)। লোকেরা এরপর এগুলোরই ইবাদত শুরু করে দিল। (তাফসীরে তাবারী ১৯/১১৮) হাফেয ইবনে কাসীর রহ. সূরা নূহ এর ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ছবি-ভাস্কর্য এবং মূর্তি বানানোর ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত এনে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর-৮/২০৮)

পূর্ববর্তী শরীয়তে ছবির হুকুম

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন,

أن ذلك كان جائزا في تلك الشريعة وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في العبادة ليتعبدوا كعبادتهم وقد قال أبو العالية لم يكن ذلك في شريعتهم حراما ثم جاء شرعنا بالنهي عنه.

কারও কারও মতে এগুলো (চিত্র এবং ভাস্কর্য) পূর্ববর্তীদের শরীয়তে বৈধ ছিল। তারা নবীদের এবং নেককার লোকদের ইবাদতের ধরন ও আকৃতি অনুযায়ী ছবি, ভাস্কর্য তৈরি করত যেন তা দেখে দেখে হুবহু তাদের মত ইবাদত করতে পারে। আবুল আলিয়াহ বলেন, পূর্ববর্তীদের শরীয়তে এগুলো হারাম ছিল না। শরীয়তে মুহাম্মদীতে ছবির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে। (ফাতহুল বারী ১০/৪৬৭, তাফসীরে কাশ্‌শাফ ৩/৫৫৫)

সূরা সাবা এর ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস (মৃত-৩৭০হি.) বলেন,

يدل على ان عمل التصاوير كان مباحا وهو محظور فى شريعة النبى صلى الله عليه وسلم.

অন্যান্য শরীয়তে তাসবীর বানানো বৈধ ছিল। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মদীতে তা হারাম। (আহকামুল কুরআন ৩/৫৮৪)

মুফতী শফী রহ. লিখেছেন,

تصاویر کی حرمت شریعت اسلامیہ محمدیہ کا مخصوص حکم ہے ، پہلے انبیاء کی شریعتوں میں تصاویر ممنوع نہیں تھیں، جیسا کہ قرآن کریم حضرت سلیمان کے قصہ میں ان کے حکم سے جنات کا تصاویر بنانا مذکور ہے ،یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل...

اور ہجرت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں تصاویر کی حرمت کا ثبوت نہیں ہے، ہجرت کے بعد احکام حرمت کے آئے ہیں۔

ছবি হারাম হওয়া শরীয়তে মুহাম্মদীর বিশেষ হুকুম। পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তে ছবি নিষিদ্ধ ছিল না। তদ্রূপ হিজরতের পূর্বে ইসলামী শরীয়তে ছবি হারাম হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। হিজরতের পরই মূলতঃ ছবি হারাম হয়। (তাসবীর কে শরয়ী আহকাম; পৃষ্ঠা-১২)

তবে অপর এক বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, পূর্ববর্তী শরীয়তেও চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য তৈরি হারাম ছিল। ইমাম বুখারী রহ. হযরত আয়েশা রাযি. এর সূত্রে বর্ণনা করেন,

أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাদের কোন পূণ্যবান লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর ইবাদতখানা নির্মাণ করত এবং তাতে প্রতিকৃতি স্থাপন করত। এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। (সহীহ বুখারী; হা. ৪২৭)

হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন,

فإن ذلك يشعر بأنه لو كان ذلك جائزا في ذلك الشرع ما أطلق عليه صلى الله عليه و سلم أن الذي فعله شر الخلق فدل على أن فعل صور الحيوان فعل محدث أحدثه عباد الصور

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, যদি তাদের শরীয়তে ছবি জায়েযই হত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিকৃতি স্থাপনকারীদেরকে নিকৃষ্ট সৃষ্টি আখ্যায়িত করতেন না। হাদীস থেকে বোঝা গেল, চিত্রাঙ্কন, প্রতিকৃতি তৈরি এটা ছবিপূজারীদেরই আবিষ্কার। আর সূরা সাবা এর ১৩ নং আয়াতে 'তামাছীল' দ্বারা উদ্দেশ্য প্রাণহীন বস্তুর ছবি। (ফাতহুল বারী ১০/৪৬৮)

আল্লামা যামাখশারী রহ. (মৃত-৫৩৮ হি.) লিখেন,

ويجوز ان يكون غير صور الحيوان كصور الاشجار وغيرها.

সূরা সাবা এর ১৩ নং আয়াতে 'তামাছীল' দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে প্রাণহীন বস্তুর ছবি। যেমন, গাছ-গাছালি ইত্যাদির ছবি। (তাফসীরে কাশ্‌শাফ ৩/৫৫৫)

বাইবেলে এখনো পর্যন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরির নিষিদ্ধতার হুকুম বিদ্যমান রয়েছে।

`Do not make for your selves images of anything in heaven or on earth or in the water under the earth.' (HOLY BIBLE (Good news Bible) p. 80. The Bible society of India)

মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. *তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম*

(৪/৯৬) -এ তাওরাত থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন,

جاء في سفر التثنية: لئلا تفسدوا وتعملوا لانفسكم تمثالا منحوتا صورة مثال ما شبه ذكر او انثى... الخ

... যাতে তোমরা ফাসাদ সৃষ্টি না করো এবং খোদাইকৃত প্রতিকৃতি তৈরি না করো যা ছেলে-মেয়ের আকৃতি সদৃশ।

মোটকথা, পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য আকৃতি বানানো, চিত্রাঙ্কন করা, ভাস্কর্য তৈরি করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে মজবুত দলীল রয়েছে।

চিত্রাঙ্কন ও প্রতিকৃতি তৈরির ব্যাপারে হাদীসের ভাষ্য

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم

যারা প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা সৃষ্টি করেছিলে তাতে প্রাণ সঞ্চার করো। (সহীহ বুখারী; হা.৫৯৫১, সহীহ মুসলিম; হা.২১০৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون

কিয়ামত দিবসে ছবি অঙ্কনকারীদের কঠিনতম শাস্তি হবে। (সহীহ বুখারী; হা.৫৯৫০, সহীহ মুসলিম; হা.২১০৯)

আবু যুর'আ রহ. বলেন,

دخلت مع ابى هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير

আমি আবু হুরায়রা রাযি. এর সঙ্গে মারওয়ানের গৃহে প্রবেশ করলাম। সেখানে কিছু চিত্র তার দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة أوليخلقوا حبة أوليخلقوا شعيرة

ঐ লোকের চেয়ে বড় যালেম আর কে যে আমার সৃষ্টির মতো কোন কিছু সৃষ্টি করতে চায়। (তাদের যদি সামর্থ্য থাকে তবে) সৃষ্টি করুক একটি কণা, একটি শস্য কিংবা একটি যব। (সহীহ বুখারী; হা.৫৯৫৩, সহীহ মুসলিম; হা.২১১১)

সাঈদ ইবনে আবুল হাসান রহ. বলেন,

كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح.

আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর কাছে বসা ছিলাম। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি এসে তাকে বললো, হে ইবনে আব্বাস! আমি একজন হস্তশিল্পী। হাতে তৈরি প্রতিকৃতির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করি। (এই পেশা কি বৈধ?) হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আমি শুধু তোমাকে সে কথাই বলবো যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যে কেউ কোন প্রতিকৃতি তৈরি করে আল্লাহ তা'আলা তাকে আযাব দিবেন যে পর্যন্ত না সে তাতে প্রাণ দান করে। অথচ সে প্রাণ দান করতে পারবে না। এ কথা শুনে সে অস্থির হয়ে পড়ল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তখন হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, যদি তৈরি করতেই হয় তবে প্রাণহীন বস্তুর প্রতিকৃতি তৈরি করবে। (সহীহ বুখারী; হা.২২২৫)

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه وفى نسخة تصاوير.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে ছবি অঙ্কিত কিছু দেখলে তা বিনষ্ট করে দিতেন। (সহীহ বুখারী; হা.৫৯৫২)

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به فيقول انى وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من ادعى مع الله الها آخر والمصورين إسناده صحيح على شرط الشيخين.

কিয়ামত দিবসে জাহান্নাম থেকে একটি গর্দান বের হবে তার দু'টি চক্ষু হবে যা দ্বারা দেখবে, দু'টি কান হবে যা দ্বারা শুনবে, জিহ্বা থাকবে যা দ্বারা কথা বলবে। সে বলবে, আমাকে তিন ব্যক্তির (শাস্তির) দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, (১) প্রত্যেক অবাধ্য স্বেচ্ছাচারী, (২) যে আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্য ইলাহকে শরীক করে (৩) ছবি অঙ্কনকারী। (মুসনাদে আহমদ; হা.৮৪৩০, সুনানে তিরমিযী; হা. ২৫৭৪, বাইহাকী ফী শু'আবিল ঈমান; হা.৬৩১৭)

ঘরে ছবি রাখা বা টানানোর ব্যাপারে হাদীসের ভাষ্য

হযরত আবু তৃলহা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

ঐ গৃহে রহমতের ফেরেশতারা প্রবেশ করে না যাতে কুকুর বা ছবি রয়েছে। (সহীহ বুখারী; হা. ৩২২৫, সহীহ মুসলিম; হা. ২১০৬)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন,

وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكا إليه ما وجد فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب

একবার হযরত জিবরাইল আ. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত সময়ে তিনি আসছিলেন না। এতে নবীজীর কষ্ট হচ্ছিল। তিনি বেচইন হয়ে বাইরে বের হলেন। তখন জিবরাইল আ. এর সঙ্গে তার সাক্ষাত হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কষ্ট পেয়েছেন বলে অভিযোগ করলেন। তাঁকে তখন জিবরাইল আ. বললেন, আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না যাতে কোন প্রাণীর ছবি থাকে বা কুকুর থাকে। (সহীহ বুখারী; হা. ৫৯৬০)

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير

ফেরেশতারা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না যাতে মূর্তি বা ছবি রয়েছে। (সহীহ মুসলিম; হা.২১১২)

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত,

نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ছবি রাখতে এবং তা তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। (সু নানে তিরমিযী; হা.১৭৫৩)

যারা প্রাণীর প্রতিকৃ তি তৈরি করে তারা আল্লাহ ও তঁ ার রাসূ লের লা'নতে পতিত হয় এবং তারা আল্লাহ তা'আলার নিকৃ ষ্টতম মাখলু ক

যারা প্রতিকৃ তি তৈরি করে কিংবা চিত্রাঙ্কন করে তাদের ব্যাপারে হযরত আয়েশা রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

أولئك شرار الخلق عند الله

এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকৃ ষ্টতম সৃ ষ্টি। (সহীহ বু খারী; হা. ৪২৭)

হযরত আবু জু হাইফা রাযি. বলেন,

إن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন রক্তের মূ ল্য, কু কু রের মূ ল্য এবং ব্যভিচারের দ্বারা উপার্জিত অর্থ। আর লা'নত করেছেন সু দ ভক্ষণকারী ও সু দ প্রদানকারীর উপর, উল্কি অঙ্কনকারী ও উল্কি গ্রহণকারীর উপর এবং প্রতিকৃ তি প্রস্তুতকারীর উপর। (সহীহ বু খারী; হা. ৫৯৬২, সু নানে আবু দাউদ; হা. ৩৪৮৩)

হযরত ইকরামা রহ. বলেন,

إن الذين يؤذون الله ورسوله...

(যারা আল্লাহ ও তঁ ার রাসূ লকে কষ্ট দেয় আল্লাহ দু নিয়া ও আখেরাতে তাদের উপর লা'নত করেছেন।) এই আয়াত দ্বারা ছবি অঙ্কনকারী উদ্দেশ্য। (মু সান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.২৫৭২৪, আত-তামহীদ ৮/৫২৭, হিলয়াতু ল আউলিয়া ৩/৩৩৮)

বসা বা হেলান দেয়ার বস্তুতে ছবি অঙ্কন করাও হারাম

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

عن عائشة رضي الله عنها: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فقام النبي صلى الله عليه و سلم بالباب فلم يدخل فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت قال ما هذه النمرقة. قلت لتجلس عليها وتوسدها قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور

তিনি একটি গদি বা তাকিয়া ক্রয় করেছিলেন, যাতে ছবি অঙ্কিত ছিল। রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে দরজায় দঁ াড়িয়ে গেলেন। ভেতরে প্রবেশ করলেন না। আয়েশা রাযি. বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কাছে তওবা করছি (একটু বলবেন,) আমার কী অপরাধ? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা কেমন গদি! আমি বললাম, আপনার বসা ও হেলান দেয়ার জন্য! নবীজী বললেন, এমন ছবিওয়ালাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা সৃ ষ্টি করেছ তাতে প্রাণ সঞ্চার করো। আর ফেরেশতারা ঐ গৃ হে প্রবেশ করেন না যাতে প্রাণীর ছবি থাকে। (সহীহ বু খারী; হা. ২১৫০)

'সূ রত' ও 'তিমছাল' এর অর্থ

ছবি সম্পর্কিত হাদীসগুলোতে কোথাও 'সূ রত' শব্দটি এসেছে, কোথাও এসেছে 'তিমছাল'। আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

قيل لا فرق بين الصورة والتمثال والصحيح أن بينهما فرقا (1) وهو أن الصورة تكون في الحيوان والتمثال يكون فيه وفي غيره (2) وقيل التمثال ما له جرم وشخص والصورة ما كان رقما أو تزويقا في ثوب أو حائط

কারো কারো মতে 'সূ রত' এবং 'তিমছাল' এর মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য নেই। তবে এক্ষেত্রে সঠিক কথা হলো, এ দু টোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। (১) 'সূ রত' বলা হয়, প্রাণীর আকৃ তিকে। আর 'তিমছাল' যেমনিভাবে প্রাণীর আকৃ তি বোঝায়, প্রাণহীন বস্তুর আকৃ তিও বোঝায়। (২) কারো মতে 'তিমছাল' বলা হয় সেই ছবিকে যার আকার আয়তন রয়েছে। আর ছবি বলা হয় আকার আয়তনহীন চিত্র, কাপড় বা দেয়ালের কারুকাজকে। (উমদাতু ল কারী ১৫/১২৪)

আল্লামা যামাখশারী রহ. লিখেন,

لأنّ التمثال كل ما صوّر على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان. أوتصوّر محذوفة الرؤوس

কোন কিছু র সদৃ শ যে ছবি অঙ্কন করা হয় সেটাই 'তিমছাল' প্রাণীর হোক কিংবা প্রাণহীন বস্তুর। (তাফসীরে কাশ্শাফ ৩/৫৫৫)

আল্লামা ইবনু ল হুমাম লিখেছেন,

في المغرب الصورة عام في ذي الروح وغيره، والتمثال خاص بمثال ذي الروح لكن المراد هنا ذو الروح، فإن غير ذي الروح لا يكره

আল-মু গরিব-এ আছে, 'সূ রত' শব্দটি প্রাণী এবং প্রাণহীন উভয় ছবির ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। আর 'তিমছাল' প্রাণীর আকৃ তির সাথে খাস। তবে হাদীসে উভয় শব্দ দ্বারা প্রাণীর ছবিই উদ্দেশ্য। কারণ প্রাণহীন বস্তুর ছবি হারাম না। (ফাতহুল কাদীর ১/৩৬২)

সু তরাং বোঝা গেল, হাদীসে 'তিমছাল' দ্বারা উদ্দেশ্য প্রাণীর ছবি; দেহবিশিষ্ট হোক বা না হোক।

দেহ বিশিষ্ট মূ র্তি যেমন হারাম তেমনই অঙ্কিত ছবিও হারাম

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বলেন,

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين

রাসূ লু ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফর থেকে ফিরলেন। আমি কক্ষের দরজায় একটি পর্দা ঝু লিয়েছিলাম যাতে ছবি অঙ্কিত ছিল। তিনি তা খু লে ফেললেন এবং বললেন, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিন আযাব দেয়া হবে যারা আল্লাহর সৃ ষ্টি-বৈশিষ্ট্যের সাদৃ শ্য গ্রহণ করে। উম্মু ল মু মিনীন বলেন, তখন আমরা তা কেটে ফেললাম এবং একটি বা দু 'টি বালিশ বানালাম। (সহীহ বু খারী; হা. ৫৯৫৪, সহীহ মু সলিম; হা.২১০৭)

মু সান্নাফে ইবনে আবী শাইবাতে (হা. ২৫৭১৮) হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে,

فلما رآه تغير لونه وهتكه بيده، ثم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذي يشبهون بخلق الله

ছবিযু ক্ত পর্দা দেখে রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি নিজ হাতে তা ফেড়ে ফেললেন।

হযরত আলী রাযি. বলেন,

صنعت طعاما فدعوت النبي صلى الله عليه و سلم فجاء فدخل فرأى سترا فيه تصاوير فخرج وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير

আমি খাবার তৈরি করলাম এবং রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত করলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করে একটি পর্দা দেখতে পেলেন যাতে ছবি অঙ্কিত ছিল। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবং

বললেন, ফেরেশতারা ঐ ঘরে প্রবেশ করেন না যাতে ছবি রয়েছে। (সু নানে নাসাঈ; হা. ৫৩৫১)

আব্দু ল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

ان النبي صلى الله عليه و سلم لما رأى الصور في البيت يعني الكعبة لم يدخل وأمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله والله ما استقسما بالأزلام قط

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতু ল্লাহয় বিভিন্ন প্রতিকৃ তি দেখে তাতে প্রবেশ করতে অস্বীকৃ তি জানালেন এবং সেগুলো বিলু প্ত করার আদেশ দিলেন। তার আদেশে সেগুলো মু ছে দেয়া হয়। এগুলোর মধ্যে ইবরাহীম আ. ও ইসমাঈল আ. এর প্রতিকৃ তি ছিল। তঁ াদের হাতে ছিল ভাগ্য নির্ধারণী শর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ ওদের (এগুলোর নির্মাতাদের) ধ্বংস করুন। তাদের জানা ছিল যে, এই দু 'জন কখনও শর দ্বারা ভাগ্য গণনা করেননি। (মু সনাদে আহমদ; হা.৩৪৫৫)

إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري

উসামা রাযি. বলেন,

دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، فرأى في البيت صورة، فأمرني فأتيته بدلو من الماء، فجعل يضرب تلك الصورة، ويقول

আমি রাসূ লু ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কা'বা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলাম তখন কিছু চিত্র তঁ ার দৃ ষ্টিগোচর হলো। তিনি এক বালতি পানি আনতে বললেন। আমি পানি উপস্থিত করলাম। তিনি পানি দ্বারা ছবিগুলো মু ছতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, **(১৭ নং পৃ ষ্ঠায়)**

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, (আলী অ্যান্ড নূ র রিয়েল এস্টেট) সাতমসজিদ, মু হাম্মদপু র,

আকাইদ

সাইফু ল ইসলাম সাকিব
তাকওয়া মাদরাসা, মু হাম্মদপু র, ঢাকা।

১৬. প্রশ্ন: আমার এক আত্মীয় আমাকে বলেছেন, আমাদের তাবলীগ জামা'আত সম্পর্কে সৌদী সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় বিব্রতকর একটি ফাতওয়া (যা তিনি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করেছেন) দিয়েছে। ফাতওয়াটি নিম্নরূপ,

সৌদী আরবের উচ্চতর গবেষণা ও ইফতা কমিটি (SRI) কে সু য়ূ তী রহ. এর কিতাব *আলহাবী* এর একটি বানোয়াট কাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। (যে কাহিনী *ফাযায়েলে হজ্জ* কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে)। ঘটনাটি এই, বিখ্যাত সূ ফী ও বু যু র্গ হযরত শাইখ আহমাদ রেফায়ী ৫৫৫ হিজরী সনে হজ্জ সমাপন করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওযা যিয়ারত করার জন্য মদীনায় হাযির হন। সেখানে তিনি রওযার সামনে দঁ াড়িয়ে নিম্নোক্ত বয়েত পড়েন।

'দূ রে থাকাবস্থায় আমি আমার রূহকে হুযু রের খেদমতে পাঠাইয়া দিতাম। সে আমার নায়েব হইয়া আস্তানা শরীফে চু ম্বন করিত। আজ আমি সশরীরে দরবারে হাজির হইয়াছি। কাজেই হুযু র আপনার হস্ত বাড়াইয়া দেন, যেন আমার ঠেঁ াট উহা চু ম্বন করিয়া তৃ প্তি হাসিল করে।' বয়েত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবর থেকে হস্ত মু বারক বের হয়ে আসে এবং হযরত রেফায়ী রহ. উহা চু ম্বন করে তৃ প্তি হাসিল করেন।

বলা হয় যে, সে সময় মসজিদে নববীতে ৯০ হাজার লোকের সমাগম ছিল। সকলেই বিদু ্যতের মত হাত মু বারকের চমক দেখতে পায়। তাদের মধ্যে আব্দু ল কাদের জিলানীও ছিলেন। (ফাযায়েলে হজ্জ-২৫৮ পৃ ষ্ঠা নবী প্রেমের কাহিনী)

প্রশ্নকর্তা উল্লেখ করেন, শাইখ যাকারিয়া রহ. দক্ষিণ এশিয়ার তাবলীগ জামাআতের প্রবক্তাদের একজন। তার কিতাবে অনেক বানোয়াট কাহিনী আছে। এই ধরনের বানোয়াট কাহিনী যে ইমাম বিশ্বাস করে তার পিছনে নামায পড়া ঠিক হবে কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে সৌদী আরবের স্থায়ী উচ্চতর গবেষণা ও ইফতা কমিটির চেয়ারম্যান ও সাবেক গ্র্যাণ্ড মু ফতী শাইখ আব্দু ল আযীয রায় জারি করেন যে, এই বিবরণ মিথ্যা ও একদম ভিত্তিহীন। কারণ মৃ ত মানু ষ কবরে নড়তে পারে না। সে সাধারণ মানু ষ হোক বা নবী হোক না কেন। তাই আহমদ রেফায়ীর প্রশ্নোক্ত দাবী ভিত্তিহীন, বিভ্রম যা বিশ্বাস করা উচিত নয়। কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর, উমরসহ অন্য কোনো সাহাবী রাযি. এর জন্য হাত প্রসারিত করেননি।

সু য়ূ তী রহ. নিজ কিতাবে বক্তব্যের সত্যতা পরীক্ষা না করেই বিভিন্ন আলেমদের নামে মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা, যে উক্ত কাহিনী বিশ্বাস করবে, তার পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে না। যেহেতু তিনি ভু ল আকীদা ও বিশ্বাস ধারণ করেন। ফাজায়েলে আমল ও এই ধরনের বানোয়াট কাহিনী সংবলিত বই পড়া জায়েয নেই।

ফাযায়েলে হজ্জ কিতাবে আরও একটি বানোয়াট কাহিনী আছে, যদি তা আমরা ইসলামী শিক্ষার সাথে তু লনা করি তাহলে তা গ্রহণ করা যায় না। কাহিনীটি এই, মূ সা বিন মু হাম্মাদ বর্ণনা করেন, একজন ন্যায়নিষ্ঠ ধর্মভীরু অপরিচিত ব্যক্তি একবার তওয়াফ করছিলেন। তওয়াফ অবস্থায় তিনি একটি নারী কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে পিছনে তাকালেন। তখন কা'বার রুকনে ইয়ামানীর নিকট থেকে একটি হাত বের হয়ে আসল এবং তাকে এত জোরে থাপ্পড় মারল যে, তার একটি চোখ কোটর থেকে বের হয়ে গেল। আর কাবার দরজার দিক থেকে অন্য একটি আওয়াজ আসল, যখন তু মি আমার ঘর তওয়াফ করছ, তখন তু মি অন্য কারো দিকে কেন তাকালে? এই থাপ্পড়টি তার শাস্তি। যদি ভবিষ্যতে আবার এমন কর, তাহলে আরো কঠিন শাস্তি হবে।'

এই ঘটনা পড়ার পর বিশেষ করে এই লাইনটি 'যখন তু মি আমার ঘর তওয়াফ করছ, তখন তু মি অন্য কারো দিকে কেন তাকালে?' পাঠকের মনে ধারণা জন্মাবে যে, আল্লাহ তা'আলা কা'বা ঘরের দেয়ালের ওপাশেই ছিলেন এবং থাপ্পড় মেরেছেন। এই ধারণা ভয়ংকর অজ্ঞতা।

এই হলো, উক্ত ফাতাওয়ার অনু লিপি। এই ফাতাওয়া সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য
জানতে চাই।

উত্তর: প্রশ্নোক্ত ফাতাওয়াটি যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রদান করা হয়েছে, তা কারামাতের অন্তর্ভু ক্ত। আর আহলে সু ন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত মতে বু যু র্গানে দীনের কারামাত সত্য। এটা আওলিয়ায়ে কেরামের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামত। সত্যিকার অর্থে আল্লাহওয়ালা, খোদাভীরু কোনো বু যু র্গ থেকে যদি কোনো কারামাত তথা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, আর তা ইসলামের কোনো আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে তা সত্য বলে জানতে হবে। এটাই আহলে সু ন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা। ইসলামের ইতিহাসে বু যু র্গানে দীনের কারামাতের অনেক সত্য ঘটনা রয়েছে। যা সাধারণ মানু ষের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। কোনো কারামাতকে মনগড়া দলীলের ভিত্তিতে বানোয়াট বলার কোনো সু যোগ নেই। বরং কারামাতকে অবিশ্বাস করা মু তাযিলাদের আকীদা।

আকীদার বিশ্ববিখ্যাত কিতাব *আকীদাতু ত তহাবী* তে ইমাম আবু জাফর তহাবী রহ. বলেন, ونؤمن بماجاء من كراماتهم 'আমরা আউলিয়ায়ে কেরাম-এর কারামাতকে বিশ্বাস করি।' (আকীদাতু ত তৃহাবী ৩/৪৬২ মিসরী নু সখা)

সুতরাং SRI চেয়ারম্যান যদি কারামাতের ব্যাপারে প্রশ্নোক্ত রায় জারি করে থাকেন, তাহলে আমরা তাকে ভুল ফাতাওয়া বলেই আখ্যায়িত করবো এবং তা একান্তই তার ব্যক্তিগত রায় বলে মনে করবো। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার সাথে উক্ত ফাতাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। উপরন্তু মৃতদের সম্পর্কে মৌলিক যে আকীদার কথা তিনি বলেছেন তাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা নয়। তিনি বলেছেন, মৃতরা কবরে নড়াচড়া করতে পারে না, চাই নবী হোক বা সাধারণ মানুষ হোক। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো, নবীগণ কবরে নামায পড়েন। অতএব, তারা নড়াচড়াও করেন।

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নবী-রাসূলগণ কবরে জীবিত, নামাযরত আছেন। (মুসনাদে আবু ইয়ালা ৩/১৩৯) হাফেজে হাদীস হাইসামী রহ. বলেন, এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/২৭৬)

হযরত আনাস রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরও বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মেরাজের রাত্রে আমি লাল টিলার পাশে হযরত মূসার নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছি। তিনি স্বীয় কবরে নামায আদায় করছিলেন। (সহীহ মুসলিম হা. ২৩৭৫)

স্মর্তব্য, মেরাজের প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূসা আ. কে দেখেছেন ষষ্ঠ আসমানে। আল্লামা তকী উসমানী দা.বা. আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর বরাত দিয়ে বলেছেন, আসমানে রয়েছে মূলত হযরত মূসার রূহ। আর কবরে অবস্থিত শরীরের সাথে রয়েছে রুহের শক্তিশালী সম্পর্ক। যার বদৌলতে তিনি কবরে নামায পড়েন এবং তার প্রতি প্রেরিত সালামের উত্তর দেন। (তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৫/৩২)

এছাড়া দুই ইহুদি কর্তৃক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দেহ মোবারক চুরির অপচেষ্টার বিষয়ে সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গী রহ. কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক স্বপ্নযোগে অবহিত করিয়ে দেওয়ার ঘটনা কিছু জাহেল আহলে হাদীস ছাড়া কোনো মুসলমানের অজানা আছে কি? আল্লাহ প্রদত্ত কুদরতে সেটা যদি সম্ভব হয়ে থাকে, তাহেল এই ফাতওয়ার ভিত্তি যে ঘটনার উপর তা কেন অসম্ভব হবে?

উল্লেখ্য, বর্তমান আরব আলেমদের অনেকেই দীন সম্পর্কে গভীর ইলমের অভাব রয়েছে। যার কারণে তারা প্রায়ই উপমহাদেশের অজ্ঞ আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে থাকেন। প্রশ্নের সাথে সংযুক্ত ফাতওয়াটি এরই একটি প্রমাণ। তাছাড়া আরব আলেমদের বেশভূষা দেখলেও আপনি তাদের ইলম ও আমল সম্পর্কে আন্দায করতে পারবেন। দীনের সহী অনুসরণ করতে হলে ইলম ও আমলে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সংস্পর্শে থেকে দীন শিখতে হবে। ইন্টারনেটে থেকে দীন শিখতে গেলে গোমরাহী নিশ্চিত। বর্তমানে কাদিয়ানী, আগাখানী, রেযাখানীসহ আরো অনেক বাতিল সম্প্রদায় ইন্টারনেটে ফাতাওয়া প্রচার করে থাকে। যার শুদ্ধতা সাধারণ মুসলমানদের পক্ষে যাচাই করা সম্ভব নয়। কাজেই ইন্টারনেট সাধারণ মানুষের দীনী ইলম অর্জনের সঠিক মাধ্যম নয়। (মুসনাদে আবু ইয়ালা ৩/১৩৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৮/২৭৬, সহীহ মুসলিম হা. ২৩৭৫, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৫/৩২, সুনানে আবু দাউদ হা. ১৫৩১, আকীদাতুত তাহাবী ৩/৪৮৫)

কাওসার খান
হাজারীবাগ. ঢাকা।

১৭. প্রশ্ন: আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, 'তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন' কিংবা 'তিনি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।' এ জাতীয় কথা বলা জায়েয কি না? এ জাতীয় কথাকে কুফরী কথা বলা যাবে কি না?

উত্তর: 'অকালে মৃত্যুবরণ' করার কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ মৃত্যু পূর্ব থেকেই র্নিধারিত। এক মুহূর্ত আগে পরে তা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, لكل امة اجل... অর্থ : 'প্রত্যেক জাতির এক সময় নির্ধারিত আছে। যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব করতে পারবে না ত্বরাও করতে পারবে না।' (সূরা আরাফ- ৩৪)

সুতরাং কেউ অকালে মৃত্যুবরণ করেছে এমন কথা বলা জায়েয নেই। তবে কথাটি যারা বলে তারা স্থুল চিন্তা থেকেই বলে। তাকদীর অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে বলে না। কাজেই এটাকে কুফরী বলা যাবে না। সুতরাং যারা তাকদীরের প্রতি অবহেলা না করেই এমনটি বলে তাদের এ কথা বলার দ্বারা কুফরী হবে না। বা ঈমানের ক্ষতি হবে না। তবে জেনেশুনে এমন কথা বলা পরিহার করা জরুরী।

তদ্রুপ 'মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে' এ জাতীয় কথা বলা জায়েয নেই। কারণ পাঞ্জা লড়ার বিষয়টি সাধারণত সমশক্তি সম্পন্নদের মাঝে হয়, যেখানে হার-জিত উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মৃত্যুর ব্যাপারটি এমন নয়। মৃত্যু হল সরাসরি আল্লাহ তাআলার হুকুম। এর সাথে মানুষের পাঞ্জা লড়ার প্রশ্নই আসে না। তাই এমন কথা বলা জায়েয নেই। আর কোনো মুসলমান যেহেতু পাঞ্জা লড়ায় বিশ্বাস রাখে না, বরং অসাবধানতার কারণে এসব কথা মুখে চলে আসে। তাছাড়া কুফরীর জন্য কথাটি প্রচলিত বা প্রসিদ্ধ নয়, তাই কোনো মুসলমান এই কথা বললে কুফরী হবে না। তবে জেনে শুনে এমন কথা বলা পরিহার করা জরুরী। (সূরা আরাফ- ৩৪, সূরা ইউনুস- ৪৯, সূরা মুনাফিকূন- ১১, সূরা নূহ- ৪, রদ্দুল মুহতার- ৪/২৩০)

ইবাদত

মনিরুজ্জামান
পুলপাড়, ঢাকা।

১৮. প্রশ্ন: বিতর নামাযের তৃতীয় রাকাআতে দুআয়ে কুনূত পড়ার আগে হাত উঠানোর দলীল কী?

উত্তর: বিতর নামাযের তৃতীয় রাকাআতে দুআয়ে কুনূত পড়ার আগে তাকবীর দিয়ে হাত উঠানোর আমল ইসলামের সোনালী

যু গ থেকে এই পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চালু রয়েছে। এই ধারাবাহিকতাই এই আমলের পক্ষে বড় দলীল। আরো জানতে দেখু ন *মু সান্নাফে ইবনে আবী শাইবা*। তাতে রয়েছে,

عن مغيرة عن إبراهيم قال ارفع يديك للقنوت. حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا سفيان عن ليث عن عبد الرحمن بن الاسود عن أبيه عن عبد الله أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر.

حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال كان عبد الله (هوابن مسعود رض) يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه فيقنت قبل الركعة.

(মু সান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; ৭০২৭, ৭০২৬, ৭০২৮, আল মু জামু ল কাবীর; হা. ৯৪২৫, জু যয়ে রফয়ে ইয়াদাইন-বু খারী পৃ ষ্ঠা ২৮)

আশেকে ইলাহী
রাজবাড়ী।

১৯. প্রশ্ন: কয়েক বছর যাবত আমার পেশাবের সামান্য একটু বেগ হলেই ২/১ ফোটা পেশাব বের হয়ে কাপড়ে লেগে যায়। শীতকালে এই সমস্যা খু ব বেশি হয়। আমি অনেক সময় কর্মস্থলে বা ভ্রমণে থাকি। তখন অন্য কোন কাপড়ও সাথে থাকে না। এখন প্রশ্ন হলো, আমি কীভাবে কাপড় পাক করে নামায পড়বো? অনেক সময় ঐ পেশাবলাগা কাপড়েই নামায পড়েছি, আমার সেই নামায হয়েছে কি না?

উত্তর: কাপড়ের যে অংশে পেশাব লেগেছে ঐ অংশটু কু তিনবার ভালভাবে ধৌত করে নিংড়ানোর দ্বারা কাপড় পাক হয়ে যাবে। যেহেতু কাপড়ের বাকি অংশে নাপাক লাগেনি, তাই সে অংশ নাপাকও হয়নি। এজন্য বাকি অংশ ধৌত করতে হবে না। আর ঐ ধৌত করা ভেজা কাপড় পরিধান করেও নামায পড়া যাবে।

আর ইতিপূ র্বে পেশাবলাগা কাপড়সহ যে নামায পড়েছেন, তা মাকরূহ হয়েছে, তবে আদায় হয়ে গেছে। কেননা ২/১ ফোটা পেশাব লেগে যাওয়া কাপড় পরিধান করে নামায পড়লে নামায ফাসিদ হয় না, মাকরূহ হয়। এজন্য ঐ নামাযের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিবেন। নতু ন করে পড়তে হবে না।

উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে এর সহজ সমাধানের জন্য বাইরে বের হওয়ার সময় জাঙ্গিয়া পরে তার ভেতর টিস্যু পেপার রেখে দিতে পারেন। পেশাব নির্গত হলেও ঐ টিস্যু ফেলে দেওয়াই যথেষ্ট হবে। তবে পেশাব বের হওয়ার পর নতু ন করে উযূ করতে হবে। (সু নানে তিরমিযী; হা. ১১৭, মু সনাদে আহমাদ ৪/২৫৩, রদ্দু ল মু হতার ১/৫৭১, হাশিয়াতু ত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃ ষ্ঠা ১৬২, ইমদাদু ল আহকাম ১/৩৯৫)

মাওলানা সাকী খান
শাহরাস্তি, চাঁ দপু র।

২০. প্রশ্ন: (ক) একদিনে সারা বিশ্বে রোযা শুরু করা এবং ঈদ উদযাপন করার শরয়ী বিধান কি? আমাদের দেশের যারা সৌদি আরবের সাথে মিলিয়ে রোযা-ঈদ করছে, তারা কি ভু ল করছে?

(খ) জু মু আর নামায সারা বিশ্বে কিভাবে একদিনে অনু ষ্ঠিত হয়? সারা বিশ্বে যদি একই দিনে রোযা-ঈদ পালন না করা হয়, তহলে তো অনেক সমস্যা। যেমন শবে কদর, শবে বরাত, শবে মেরাজসহ অন্যান্য দিনগুলো ভিন্নভাবে আদায় করার কারণে আরবী তারিখও ভিন্ন হয়ে যাবে। অথচ বিষয়টি এমন নয়। এর সমাধান কি?

উত্তর: (ক) হাদীস শরীফে চাঁ দ দেখে রোযা রাখতে এবং চাঁ দ দেখে ঈদ পালন করার কথা বলা হয়েছে। সু তরাং কোথাও চাঁ দ দেখা গেলে এতটু কু দূ রত্বে দেখা ধর্তব্য যতটু কু দু রত্ব থেকে ঐ দিনে স্বাভাবিকভাবে ঐ চাঁ দ দেখা সম্ভব। যেমন সহীহ মু সলিমের এক হাদীসে এসেছে, হযরত কু রাইব রাযি. সিরিয়ায় থাকাবস্থায় মদীনার হিসাবে একদিন পূ র্বে বৃ হস্পতিবার সন্ধ্যায় চাঁ দ দেখেছেন এবং সে মতে শুক্রবার হতে রোযা রাখা শুরু করেছেন। মাসের শেষের দিকে হযরত কু রাইব মদীনায় এসে সিরিয়ায় একদিন পূ র্বে রোযা রাখার সংবাদ হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে অবহিত করেন এবং সিরিয়ার হিসাবে ত্রিশদিন পূ র্ণ হয়ে গেলে ঈদ পালন করতে বলেন। জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমরা মদীনায় একদিন পরে চাঁ দ দেখেছি এবং সে হিসাবেই রোযা রাখছি, এখন চাঁ দ দেখলেই ঈদ করব। অন্যথায় আমাদের হিসাবে ত্রিশটি রোযা পূ র্ণ করব। সিরিয়ার চাঁ দ দেখা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে চাঁ দ দেখে রোযা রাখতে এবং চাঁ দ দেখে ঈদ পালন করতে বলেছেন। উক্ত ঘটনায় হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. সিরিয়ায় চাঁ দ দেখার কথা নির্ভরযোগ্য সূ ত্রে জানার পরও মদীনাতে একই দিন ঈদের ব্যবস্থা করেননি। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে তা করতে পারতেন। আসলে একই দিনে রোযা বা ঈদ পালন করাকে তারা জরুরী মনে করতেন না। তাই এ ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেননি। আর সে কারণেই কিছু লোক যদি অন্য দেশে রোযা রাখা শুরু করে রামযানের শেষে নিজ দেশে আসে এবং দেশের লোকদের একদিন আগেই তাদের রোযা ত্রিশটি পূ র্ণ হয়ে যায় অথচ দেশের লোকেরা চাঁ দ না দেখায় ত্রিশতম রোযা রাখছে, তাদের জন্য স্থানীয় মু সলামানদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঈদ পালন করা জায়েয নেই। সু তরাং আমাদের দেশের যারা নিজ দেশে চাঁ দ না দেখা সত্ত্বেও সাধারণ দেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একদিন আগে রোযা রাখে বা ঈদ পালন করে তারা মু সলামনদের মাঝে বিভেদ সৃ ষ্টি করে ও শরীয়তের হুকু ম লঙ্ঘন করে গোমরাহীতে লিপ্ত আছে এবং গুনাহের কাজ করছে।

(খ) জু মু আসহ অন্যান্য সকল নামায ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ওয়াক্তে আদায় করা হয়। আর শরীয়তে অন্য দেশের সময়ানু যায়ী কোনো ইবাদাতের আদায় বা কাযা সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না। বরং নিজের দেশের হিসাবই এক্ষেত্রে ধর্তব্য। সু তরাং প্রত্যেক দেশবাসী নিজ নিজ দেশের সময়ের পাবন্দি করলে নিজের দেশের তারিখ হিসাবে শবে বারাআত, কদর, রোযা এবং ঈদ ইত্যাদি ঠিক থাকবে। যদিও তা অন্যদেশের তারিখের সাথে মিল না থাকে।

আর আপনার দাবী যে, 'গোটা বিশ্বে একই দিন জু মু আ আদায় করা হয়' কিন্তু প্রশ্ন হল, তারা একই সময়

জু মু আ আদায় করে কি? বরং এক এলাকার লোকজন তো অন্যদের তু লনায় বার ঘন্টা পরেও জু মু আ আদায় করে। (সূ রা বাকারা- ১৩৫, ফাতহুল মু লহিম ৩/১১২, হাশিয়াতু ত তহতবী আলা মারাকিল ফালাহ; পৃ ষ্ঠা ৪৩৬, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতু হু ৩/১৬৫৯, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ২/৩২)

আব্দু ল হালীম
বগুড়া।

২১. প্রশ্ন: চেয়ারে নামায পড়া অবস্থায় যদি দাঁ ড়ানো হয়, তাহলে কাতার সোজা হয় না। এর দ্বারা নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না? আর কোন কোন ওযরে চেয়ারে বসে নামায পড়া যায়?

উত্তর: যেসব লোক গ্রহণযোগ্য কোনো ওযরের কারণে যমীনে বসতে অক্ষম এবং সু ন্নাত তরীকায় রুকু ও সিজদা করতে সক্ষম নয় বা শুধু সিজদা করতে সক্ষম নয় কিন্তু দাঁ ড়াতে সক্ষম, তাদের জন্য দাঁ ড়ানো ফরয নয়। তাই ঐ সকল লোক রুকু -সেজদাসহ সব রোকন চেয়ারে বসেই আদায় করবে। তাদের জন্য কিয়াম আবশ্যক নয়। এতদসত্ত্বেও যদি তারা কিয়াম করে, আর রুকু সিজদা বসে বসে আদায় করে, তাহলেও নামায হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, যমীনে বসতে সক্ষম এবং বসাবস্থায় সু ন্নাত তরীকায় রুকু -সিজদা করতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয নেই। আর যদি যমীনে বসতে সক্ষম হয় কিন্তু বসাবস্থায় রুকু -সিজদা করতে সক্ষম না হয়, অর্থাৎ ইশারায় রুকু -সিজদা করতে হয়, তাহলে তার জন্য যমীনে বসে নামায পড়া উত্তম। তবে এই ব্যক্তি যদি চেয়ারে বসে নামায পড়ে, তাহলে নামায হয়ে যাবে কিন্তু মাকরূহ হবে। (সহীহ বু খারী; হা. ৭১৯, সু নানে কু বরা নাসাঈ; হা. ৮৮৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৩৬)

মু আমালাত

আনীসু র রহমান
ধানমন্ডি, ঢাকা।

২২. প্রশ্ন: ঈদের নামাযে ইমামের কথা বলে টাকা উঠিয়ে সেই টাকা থেকে কিছু টাকা ইমামকে দিয়ে বাকি টাকা ঈদগাহ ও মসজিদ ফান্ডে ব্যয় করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর: যখন কোনো বিশেষ খাতের কথা বলে জনগণ থেকে চাঁ দা উঠানো হয়, তখন উক্ত টাকা ঐ খাতেই খরচ করা আবশ্যক। অন্য খাতে খরচ করা জায়েয হবে না। অন্য খাতে খরচ করতে হলে সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে খরচ করতে হবে। তাই এ ক্ষেত্রে উচিত হলো, বিশেষ কোনো খাতের কথা উল্লেখ না করে সাধারণ খরচের কথা উল্লেখ করে চাঁ দা তোলা। যেমন, এ কথা বলা যে, ঈদগাহের যাবতীয় ব্যবস্থাপনার জন্য যার যতটু কু সামর্থ্য হয় দান করুন।

তাছাড়া ইমাম সাহেবের নামে চাঁ দা উঠালে একেতো তাকে অপমান করা হয়, অন্য দিকে অন্যখাতে খরচ করার মত নাজায়েয কাজেও লিপ্ত হতে হয়। তাই আমাদের বর্ণিত পদ্ধতিতে টাকা উঠানোই শ্রেয়। (আদ্দু ররুল মু খতার ৪/৩৫৯, ফাতাওয়া মাহমূ দিয়া ২৩/২৪৩)

উমর ফারূক
হাজারীবাগ, ঢাকা।

২৩. প্রশ্ন: যারা মসজিদ, মাদরাসা ও ঈদাগাহের জন্য টাকা কালেকশন করে তাদেরকে সেই টাকা থেকে পারিশ্রমিক দেওয়া, বিশেষ করে দাওয়াতী বক্তার মাধ্যমে যে কালেকশন করা হয় সেই কলেকশন কৃ ত টাকা হতে (যা মসজিদ, মাদরাসা ও ঈদগাহের কথা বলে উঠানো হয়) বক্তাকে হাদিয়া বা পারিশ্রমিক প্রদান করা শরীয়তের দৃ ষ্টিতে কেমন? এভাবে কালেকশন করা টাকা থেকে ইমামের বেতন দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর: এ প্রশ্নে তিনটি বিষয় রয়েছে,

ক. কালেকশনের টাকা থেকে কালেকটরকে পারিশ্রমিক হিসেবে টাকা দেওয়া। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকু ম হলো, মসজিদ, মাদরাসা ও ঈদগাহের জন্য কালেকশনকৃ ত টাকা কালেকটর কর্তৃ পক্ষের হাতে বু ঝিয়ে দিবে। কর্তৃ পক্ষ টাকা হাতে পাওয়ার পর উক্ত টাকা থেকে নির্ধারিত হারে কালেকটরকে টাকা দিবে। এভাবে করলে বৈধ হবে। আর যদি কালেকটর কালেকশনকৃ ত টাকা কর্তৃ পক্ষের কাছে হস্তান্তর করার পূ র্বেই নিজের পারিশ্রমিক রেখে দেয়, তাহলে তা জায়েয হবে না।

খ. মাহফিল, জু মআ ও ঈদগাহে টাকা উঠানো। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকু ম হলো, যদি কাউকে চাপের মু খে ফেলে, জোরজবরদস্তি করে অথবা লজ্জায় ফেলে টাকা না তোলা হয়, তাহলে মাহফিল, জু মআ ও ঈদগাহে টাকা উঠানো জায়েয আছে। আর যদি পঁ যাচে ফেলে বা লজ্জায় ফেলে টাকা উঠানো হয়, তাহলে তা জায়েয হবে না।

গ. কালেকশনকৃ ত টাকা থেকে বক্তা ও ইমামকে টাকা দেওয়া। এক্ষেত্রে শরীয়তের হুকু ম হলো, যদি মহফিলের খরচ বাবদ ও মসজিদের জন্য টাকা উঠানোর প্রক্রিয়া বৈধ হয়, তাহলে মাহফিলের খরচের টাকা থেকে বক্তাকে হাদিয়া দেওয়া এবং মসজিদের টাকা থেকে ইমামের বেতন দেওয়া বৈধ আছে। তবে বক্তার জন্য সম্ভব হলে এ ধরনের হাদিয়া না নেওয়া চাই। কারণ হাদিয়া না নিলে, বক্তার কথার প্রতিক্রিয়া বেশি হয়। মানু ষ তার কথায় সহজে হেদায়াত প্রাপ্ত হয়। তাছাড়া সমস্ত নবীদের সু ন্নত এটাই।

আমাদের দেশে বক্তাকে দিয়ে ওয়াজ মাহফিলে টাকা কালেকশনের যে পদ্ধতি চালু রয়েছে তা শরীয়তসম্মত নয়। বরং এটা শরীয়ত গর্হিত কাজ। কাজেই ওয়াজ মাহফিলে এভাবে টাকা কালেকশন করা থেকে বেঁ চে থাকা চাই।

قال الله تعالى:يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

عن عمرو بن يثربي الضمري قال شهدت خطبة رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنى فكان فيما خطب به أن قال ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه قال فلما سمعت ذلك قلت يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم بن عمي فأخذت منها شاة فاجترزتها هل علي في ذلك شيء قال إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها.

(সূ রা হুদ- ৫১, মু সনাদে আহমাদ ৩/৪৩৩, হেদায়া ৪/৪২৫, রদ্দু ল মু হতার ৬/৪৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৪১১, ইমদাদু ল ফাতাওয়া ৩/৩৬২)

মু আশারাত

আনীসু র রহমান
ধানমন্ডি, ঢাকা।

২৪. প্রশ্ন: (ক) স্ত্রীর চিকিৎসা করা আইনত স্বামীর উপর ওয়াজিব,

সুন্নাত, মুস্তাহাব নাকি মুবাহ? কেউ বলেন, স্ত্রীর চিকিৎসা করা স্বামীর উপর আইনত ওয়াজিব নয়, বরং মানবিকভাবে ওয়াজিব। কেউ বলেন, সামর্থ্য থাকলে ওয়াজিব, সামর্থ্য না থাকলে ওয়াজিব নয়। কেউ বলেন, সিজার বা ডেলিভারি সম্পর্কীয় খরচের দায়িত্ব বাবার উপর, স্বামীর উপর এসব খরচের দায়িত্ব নেই। এ ব্যাপারে সঠিক মাসআলা জানতে চাই।

(খ) ছোট চিকিৎসা ও বড় চিকিৎসার মাপকাঠি কি? সিজার কি বড় চিকিৎসা?

(গ) মানবিক ওয়াজিব আদায় না করলে কি গুনাহ হবে?

উত্তর: (ক) সমাজের বৈধ প্রচলন শরীয়তে একটি গ্রহণযোগ্য বিষয়। কাজেই আমাদের বর্তমান সমাজের রীতি ও প্রচলন অনুযায়ী স্বামীর উপর স্ত্রীর চিকিৎসার খরচ বহন করা শরঈভাবেই ওয়াজিব।

পূর্ব যামানায় প্রচলন ছিল স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তৈরি খাবার সরবরাহ করা। স্বামী বা ঘরের অন্যদের খাবার তো দূরের কথা স্ত্রীর নিজের খাবার পাকানোও তার দায়িত্ব ছিল না। সে সময়ে স্ত্রীর চিকিৎসা খরচ বহন স্বামীর দায়িত্ব ছিল না।

বর্তমানে সেই প্রচলন পাল্টে গেছে। এখন স্ত্রীরা নিজের খাবার এবং স্বামী ও সন্তানদের খাবার নিজেই রান্না করে এবং ঘরের অভ্যন্তরীণ সকল কাজ সে নিজেই দেখাশুনা করে (যা তার দায়িত্বের অর্ন্তভুক্ত নয়)। কাজেই স্ত্রীর খোরপোষসহ চিকিৎসা খরচ এবং জরুরী হাত খরচ স্বামীর উপর বর্তাবে। তবে স্বামী অস্বচ্ছল হলে এবং পিতার সামর্থ্য থাকলে ব্যয়বহুল চিকিৎসায় অংশগ্রহণ করা পিতার নৈতিক দায়িত্ব।

(খ) উপরোক্ত হুকুমে ছোট-বড় চিকিৎসার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

(গ) মানবিক ওয়াজিব বা নৈতিক দায়িত্ব যাকে শরীয়তে 'দিয়ানাতান' ওয়াজিব বলা হয়, এ ধরনের ওয়াজিব আদায় না করলেও গুনাহ হবে। যদিও এ জাতীয় ওয়াজিবের জন্য দুনিয়ার আদালতে মামলা করা যায় না।

عن جابر رضى الله هنه فى قصة حجة الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

فى رد المحتار: أجرة القابلة على من استأجرها من زوجة وزوج ولو جاءت بلا استئجار، قيل عليه وقيل عليها . قوله قيل عليه إلخ عبارة البحر عن الخلاصة: فلقائل أن يقول عليه؛ لأنه مؤنة الجماع، ولقائل أن يقول عليها كأجرة الطبيب ا هـ وكذا ذكر غيره، ومقتضاه أنه قياس ذو وجهين لم يجزم أحد من المشايخ بأحدهما خلاف ما يفهمه كلام الشارح، ويظهر لي ترجيح الأول؛ لأن نفع القابلة معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه تأمل.

(সূরা নিসা- ৩৪, সূরা তালাক- ৭, ৪৬, সূরা বাকারা- ২৩৩, সহীহ মুসলিম; হা. ১২১৮, মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়াইতিয়্যাহ ৪২/৪১, রদ্দুল মুহতার ১/৫৮০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৪৯, ফাতাওয়া উসমানী ২/৪৯১)

আনীসুর রহমান
ধানমন্ডি, ঢাকা।

২৫. প্রশ্ন: নিঃসন্তান স্বামী মারা গেলে তার সম্পদে অন্যরাও অংশ পাবে। এজন্য তার সমস্ত বা আংশিক সম্পদ নিজ জীবদ্দশায় স্ত্রীকে অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করে দেওয়া জায়েয হবে কি না?

এমনিভাবে কন্যা সন্তানের পিতা তার সমস্ত বা আংশিক সম্পদ নিজ কন্যা ও স্ত্রীকে সমান ভাগে ভাগ করে দিলে অথবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করে দিলে জায়েয হবে কি না? এবং সাওয়াব হবে কি না?

উত্তর: নিঃসন্তান স্বামী বা কন্যা সন্তানের পিতা মারা গেলে তার সম্পদে অন্যরাও মীরাস পাবে শুধু মাত্র এই জন্য জীবদ্দশায় তার সমস্ত সম্পদ নিজ স্ত্রী, কন্যা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান করে দেওয়া শরীয়ত মতে বৈধ হবে না। তবে অন্যান্য ওয়ারিসীন যদি বদকার, জালিম হয় এবং ঐ ব্যক্তির প্রবল আশংকা হয় যে, তার সম্পদ তারা অন্যায় ও গুনাহের কাজে খরচ করবে, অথবা তার স্ত্রী-কন্যার অংশও হরণ করে নিবে, কিংবা তাদের অর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয় যে, আশংকা আছে, তার মৃত্যুর পর এরা অন্যের দারস্থ হবে, তাহলে সে ক্ষেত্রে নিজ স্ত্রী-কন্যা এমনিভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে দান করে যাওয়া জায়েয আছে। এতে কোনো গুনাহ হবে না বরং সাওয়াবের অধিকারী হবে ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য, দান করার সূরতে দান বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, যাকে দান বা হেবা করা হয় তাকে সম্পদের দখল বুঝিয়ে দেওয়া। অন্যথায় মৃত্যুর পর তা সকল ওয়ারিসের মধ্যে বণ্টন হবে। (সূরা নিসা- ১৭৬, সহীহ মুসলিম; হা. ১৬২৮, সুনানে আবু দাউদ; হা. ২৮৮৬, সুনানে তিরমিযী; হা. ২১২১, আল জাওহারাতুন নাইয়িরাহ ৩/৪০৮)

আনীসুর রহমান
ধানমন্ডি, ঢাকা।

২৬. প্রশ্ন: জনৈক মহিলা নিজ সম্পদ থেকে তার পাঁচ মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে থেকে তুলনামূলক দুর্বল এক মেয়েকে কিছু সম্পদ দান করে দিতে চান এবং প্রয়োজনে তিনি নিজে ঐ মেয়ের কাছে থাকবেন। এভাবে দান করা জায়েয হবে কি না?

জীবদ্দশায় কাউকে কিছু দিতে হলে তার নীতিমালা কী?

উত্তর: যদি উক্ত মেয়েকে দেওয়ার দ্বারা অন্য সন্তানদের মাহরূম করা বা কম দেওয়া উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে, বরং দরিদ্র কন্যাকে সাহায্য করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং সেও বাস্তবিকই সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্নোক্ত কন্যাকে অন্যদের চেয়ে বেশি দেওয়া যাবে। এতে কোনো গুনাহ হবে না।

জীবদ্দশায় কাউকে কিছু দিতে চাইলে দিতে পারে। তবে সম্পদের দখল বুঝিয়ে দেওয়া শর্ত। আর সন্তানদের কিছু দিতে চাইলে, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিবে। এ ক্ষেত্রে কমবেশি না করা চাই এবং কাউকে ঠকানোর নিয়ত না থাকা চাই। কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার ওয়ারিসদেরকে মীরাস থেকে ঠকাবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে জান্নাতের মীরাস থেকে বঞ্চিত করবেন।' (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা. ২৭০৩)

তবে যদি কেউ জীবদ্দশায় মীরাসের অংশ অনুপাতে সন্তানদের মধ্যে

সম্পদ ভাগ করে দেয়, তাহলে তাও জায়েয আছে কিন্তু এটা উত্তম নয়। (সু   নানে ইবনে মাজাহ; হা. ২৭০৩, খু   লাসাতু   ল ফাতাওয়া ৪/৪০০, রদ্দু   ল মু   হতার ৫/৬৯৬, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬/১৫১)

আব্দু   ল্লাহ
মোমেনশাহী।

২৭. প্রশ্ন: পরীর সাথে কোনো মানু   ষের বিবাহ জায়েয কি না? এবং সাক্ষীসহ কারো কোনো পরীর সাথে বিবাহ হলে তা ভেঙ্গে দেওয়া জরুরী কি না?

উত্তর: ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক কোনো পরীর সাথে মানব-পু   রুষের অথবা মানব-কন্যার সাথে জিন পু   রুষের বিবাহ জায়েয নেই। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। ভেঙ্গে দেওয়ার বা তালাক দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

قال في السراجية: لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن وإنسان الماء لاختلاف الجنس انتهى وتبعه في منية المفتي و الفيض وفي القنية سئل الحسن البصري رضي الله عنه عن التزويج بجنية فقال: يجوز بلا شهود ثم رقم آخر فقال: لا يجوز ثم رقم آخر: يصفع السائل لحماقته انتهى

(আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের ১/৩৬০, ফাতাওয়া সিরাজিয়্যাহ; পৃ   ষ্ঠা ৩৭, আকামু   ল মারজান ফী আহকামিল জান; পৃ   ষ্ঠা ৮৬)

আশরাফ আলী
মু   হাম্মদপু   র, ঢাকা।

২৮. প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়, তারপর স্ত্রী কাজীর নিকট জানানোর পর স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করে। তাহলে তালাক হবে কি না? আর এমতাবস্থায় স্ত্রীর করণীয় কী?

উত্তর: স্বামী কর্তৃ   ক তিন তালাক দেওয়ার বিষয়টি স্ত্রী যদি নিজ কানে শুনে থাকে বা নির্ভরযোগ্য সূ   ত্রে স্ত্রীর নিকট তিন তালাকের সংবাদ পৌছেঁ   থাকে, তাহলে পরবর্তীতে স্বামীর অস্বীকৃ   তি সত্ত্বেও শরীয়ত মতে উক্ত স্ত্রী তিন তালাকপ্রাপ্তা গণ্য হবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর জন্য জরুরী হলো, যেভাবে সম্ভব উক্ত স্বামী থেকে পৃ   থক হয়ে যাওয়া। তালাকের ইদ্দত পালন করে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। বিবাহোত্তর অন্যের সাথে সংসার ও সহবাস করার পূ   র্ব পর্যন্ত এই স্বামীর সাথে পু   নরায় সংসার করতে পারবে না।

وَإِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا أَبَانَهَا بِثَلَاثٍ أَوْ بِوَاحِدَةٍ فَجَحَدَ الزَّوْجُ فَحَلَّفَهُ الْقَاضِي فَحَلَفَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا قَالَتْ لَا يَسَعُهَا الْإِقَامَةُ مَعَهُ ، وَلَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئًا

(সু   নানে আবু   দাউদ; হা. ২১৯৪, তাবয়ীনু   ল হাকায়েক ১২/১১৭ শামেলা সংস্করণ, রদ্দু   ল মু   হতার ৫/৪০৭, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৫৪)

সু   মাইয়া বেগম
গাজিপু   র।

২৯. প্রশ্ন: বেশ কয়েক বছর আগে একটি ছেলের সাথে আমার দৈহিক সম্পর্ক হওয়ার পর আমরা উভয়ে সম্মতিক্রমে স্ট্যাম্পে লিখে একে অন্যকে স্বামী-স্ত্রীরূপে গ্রহণ করি। কিন্তু মৌখিক কোনো ঈজাব-কবু   ল হয়নি। তবে দু   ইজন সাক্ষীর স্বাক্ষর ছিল। এর কিছু   দিন পর একজন হুযু   র ডেকে ঈজাব-কবু   ল করা হয়। তখন আমি বিবাহতে রাজী ছিলাম না, কিন্তু আমাকে কবু   ল বলতে বাধ্য করা হয়, তাই আমি কবু   ল বলি। উল্লেখ্য, এই ঈজাব-কবু   লের মজলিসে আমরা স্বামী-স্ত্রী ও হুযু   র ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না।

এই ঘটনা সম্পূ   র্ণ গোপন ছিল কেউ জানত না, এখনও কেউ জানে না। কিছু দিন পর আমাকে পারিবারিকভাবে অনত্র বিবাহ দেওয়া হয়। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আমার বর্তমান বিবাহ বৈধ কি না? যদি বৈধ না হয়ে থাকে, তাহলে বৈধভাবে বর্তমান স্বামীর সংসার করতে হলে আমাকে কী করতে হবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: ইসলামী শরীয়াতে বিবাহ মানবজীবনে একটি গুরুত্বপূ   র্ণ অধ্যায়। মানু   ষের মানবিক প্রয়োজন শরীয়তসম্মতভাবে পু   রা করার জন্য ইসলামে বিবাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য কিছু   শর্ত রয়েছে। তার মধ্যে থেকে একটি হলো, মৌখিকভাবে ঈজাব-কবু   ল হওয়া এবং এমন দু   ইজন সাক্ষী উপস্থিত থাকা যারা ঈজাব-কবু   ল শুনবে। প্রশ্নোক্ত বর্ণনা অনু   যায়ী স্ট্যাম্পে দস্তখত করার সময়ে মৌখিকভাবে ইজাব-কবু   ল না পাওয়া যাওয়ায় প্রথম বিবাহ সহীহ হয়নি। আর পরবর্তীতে হুযু   রকে ডেকে ঈজাব-কবু   ল করার সময় দু   ইজন সাক্ষী উপস্থিত না থাকায় এবং আপনি রাজী না থাকায় সেটিও সহীহ হয়নি।

আর আপনার বর্তমান বিবাহ যা পারিবারিকভাবে সমাধা হয়েছে, তাতে যদি মৌখিক ঈজাব-কবু   ল হয়ে থাকে এবং বিবাহের মজলিসে দু   ইজন সাক্ষী উপস্থিত থেকে থাকে, তাহলে তা বৈধ হয়েছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান স্বামীর সাথে সংসার করা আপনার বৈধ হচ্ছে।

কিন্তু আপনার প্রথম বিবাহ যেহেতু শরীয়তের দৃ   ষ্টিতে অবৈধ সম্পর্ক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, তাই এখন আপনার কর্তব্য হলো, অতীতের গুনাহের জন্য আল্লাহর দরবারে সাচ্চা তাওবা করা।

وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما في البيع؟ قال في البزازية: أجاب صاحب البداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئا لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولا. وأنكره صاحب المحيط وقال: لا ما لم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع.البحر الرائق وينعقد متلبسا (بإيجاب) من أحدهما (وقبول) من الآخر (وضعا للمضي) لأن الماضي أدل على التحقيق... (فلا ينعقد) بقبول بالفعل كقبض مهر ولا بتعاط ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب ما لم يكن بلفظ الأمر فيتولى الطرفين.رد المحتار

(রদ্দু   ল মু   হতার ৩/১২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৬৭, আলবাহরুর রায়েক ৩/১৪৪, আল মাউসূ   আতু   ল ফিকহিয়্যাহ আল কু   য়াইতিয়্যাহ ৪১/২৪০)

বিবিধ

মাহবু   ব
মু   ন্সিগঞ্জ।

৩০. প্রশ্ন: আমার স্ত্রী লিভারের রোগে আক্রান্ত। ডাক্তার বলেছে, এই মু   হূ   র্তে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। আর এ ক্ষেত্রে একটি

পদ্ধতিই কেবল অবলম্বন করা যাবে। তা হলো, হাতের কনু ইতে টিউব স্থাপন করা, যা তিন বছর ধরে জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। এখন আমার জানার বিষয় হলো, লিভারের সমস্যার কারণে জন্ম নিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী এই পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয হবে কি না?

উত্তরঃ মনগড়া অজু হাতে জন্মনিরোধক পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয নেই। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উম্মাতের সংখ্যা বাড়ানোর প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আর উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে তিনি কিয়ামতের দিন অন্য নবীগণের উম্মতের উপর গর্ব করবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া সন্তান বেশি হওয়া পার্থিব জীবন এবং পরকালীন জীবনের জন্য একটি বড় পঁ ু জি। সম্পদের চেয়ে সন্তানের উপকারিতা অনেক বেশি এবং সম্পদের তু লনায় সন্তানের ক্ষতি অনেক কম। বর্তমানে মানু ষ নির্বোধ হওয়ার কারণে সম্পদ বেশি হওয়াকে অপছন্দ করে না অথচ সন্তান বেশি হওয়াকে অপছন্দ করে।

তবে বিশেষ কোনো রোগের কারণে যদি বিজ্ঞ মু সলিম দীনদার ডাক্তার প্রবল আশঙ্কা ব্যক্ত করেন, তাহলে তখন সাময়িকভাবে সন্তান গ্রহণ থেকে বিরত থাকা যাবে। সু তরাং আপনার স্ত্রীর ব্যাপারে যদি দীনদার বিজ্ঞ ডাক্তার সন্তান গ্রহণ প্রবল ঝু কিপূ র্ণ বলে থাকেন, হাতের কনু ইয়ে টিউব ব্যবহার করার মাধ্যমে সাময়িকভাবে সন্তান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা জায়েয হবে। (সু নানে আবু দাউদ; হা. ২০৫০, সহীহ বু খারী; হা. ২২২৯, ৬৬০৩, সহীহ মু সলিম; হা. ১৪৪২, ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/২৪৬)

বেলায়েত খান

কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

৩১. প্রশ্নঃ রাতে চু ল, নখ ইত্যাদি কাটার হুকু ম কী? যদি মাকরূহ হয়, তাহলে মাকরূহে তাহরীমী কি না? অনেকে বলে, রাতে চু ল কাটলে বাবা-মার মৃ তু ্যর সময় সন্তানের যিয়ারাত নসীব হয় না। এ কথার কোনো ভিত্তি আছে কি?

উত্তরঃ রাতে নখ, চু ল ইত্যাদি কাটা জায়েয আছে। মাকরূহ নয়। কেননা নখ চু ল ইত্যাদি বড় হয়ে যাওয়ার পর কেটে ফেলা একটা ভালো কাজ। আর ভালো কাজে বিলম্ব না করা উচিত। চাই দিনে হোক বা রাতে।

উল্লেখ্য, নখ, চু ল ইত্যাদি দিনে-রাতে যে সময়ই কাটা হোক, কাটার পর তা দাফন করে দেওয়া উচিত। কেননা মানু ষের মত মানু ষের সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গও সম্মানিত। তাই মানু ষের মৃ তু ্যর পর যেমন তাকে দাফন করে দেওয়া হয়, তেমনি তার শরীরের অংশও দাফন করে দেওয়া উচিত। নাবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নখ, চু ল কাটার পর তা দাফন করতে বলেছেন।

আর 'রাতে নখ-চু ল কাটলে বাবা মায়ের মৃ তু ্যর সময় সন্তানের যিয়ারত নসীব হয় না।' এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। (সহীহ মু সলিম; হা. ১০২, ফাতহুল বারী ১০/৪০২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৫৮, আল-মাউসূ আতু ল ফিকহিয়্যাহ আল কু য়াইতিয়্যাহ ৫/১৭০)

কু রআন মাজীদে যে চার মাসকে ‘আরবা[illegible] হুরুম’ তথা সম্মানিত মাস ব[illegible] হয়েছে, রজব [illegible] অন্যতম। অন্য [illegible]লকদ, যিলহজ্জ, ও মু হাররম। এ চার মাসকে সম্মানিত মাস এজন্য বলা হয় যে, শরীয়তের জেনে রাখা প্রয়োজন, উল্লিখিত মাসগুলোর কোন কোনটিতে শরীয়তের পক্ষ থেকে সু নির্দিষ্ট ইবাদত থাকলেও রজব মাসের মধ্যে সু নির্দিষ্ট ইবাদতের কথা নেই। বরং এ মাসে নিয়মিত আমলগুলোকেই অধিক পরিমাণে যত্ন সহকারে করার ব্যাপারে রাখতো এ মাসে। তাছাড়া এ মাসের অন্যতম আকর্ষণ ছিল, পশু জবাই করা। অর্থাৎ তারা নিজেদের প্রতিমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু জবাই করে উৎসব পালন করতো এ মাসে। এভাবে নানা পদ্ধতিতে এ মাসের মর্যাদা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা চলতো গোত্রে গোত্রে।

রজব মাস : করণীয় বর্জনীয়

মু ফতী জহীরুল ইসলাম

দৃ ষ্টিতে এ মাসগুলো অতীব বরকতময় ও ফযীলতপূ র্ণ। এগুলোতে ইবাদতের সাওয়াব বহুগুণে বৃ দ্ধি পায়। তাছাড়া এক সময় এ মাসগুলোতে যু দ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম ছিল। জাহেলী যু গে এসব মাসের মর্যাদার নামে বহু রসম রেওয়াজ ও কু সংস্কার প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইসলাম সেগুলোর মর্যাদা অক্ষু ণ্ন রেখে সকল রসম রেওয়াজে সংস্কার এনেছে। সর্বোপরি এ মাসগুলোর মর্যাদা কু রআন দ্বারা প্রমাণিত। (সূ রা তাওবা ৩৪)

রজব মাসে করণীয় আমল

যেমনিভাবে এসব মাসে যে কোন আমলের সাওয়াব অন্যান্য মাসের নেক আমলের সাওয়াবের চেয়ে তু লনামূ লক বেশি, তেমনিভাবে এসব মাসে গুনাহের ক্ষতি ও ভয়াবহতাও তু লনামূ লক বেশি। তাই এসব মাসে ইবাদাতের প্রতি অধিক যত্নবান হওয়া এবং অন্যায়, অপরাধ ও গুনাহ থেকে বেঁ চে থাকার গুরুত্ব অত্যধিক।

ইমাম জাস্‌সাস রহ. *আহকামু ল কু রআন* গ্রন্থে বলেন, এ মাসগুলোর এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে এগুলোতে ইবাদত করা হলে বাকী মাসগুলোতেও ইবাদতের তাওফীক ও সাহস লাভ হয়। অনু রূপভাবে এ মাসগুলোতে পাপাচার থেকে নিজেকে দূ রে রাখতে পারলে বছরের বাকী মাসগুলোতেও পাপাচার থেকে দূ রে থাকা সহজ হয়। তাই এ সু যোগের সদ্ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হবে অপূ রণীয় ক্ষতি। (*আহকামু ল কু রআন,* জাস্‌সাস-৩/১১, *মা'আরিফু ল কু রআন,* মু হিউদ্দীন খান অনু দিত; পৃ ষ্ঠা ৫৭১)

শরীয়তে উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই নিয়মিত পালনীয় যে সকল ফরয, নফল আমল রয়েছে– যেমন, তাহাজ্জু দ, ইশরাক, চাশত, নফল রোযা, তিলাওয়াত, তাসবীহ, তাহলীল, দু রূদ, ইস্তিগফার, ইত্যাদি ইবাদতসমূ হ যথাযথ ও অধিক পরিমাণে পালনের মাধ্যমে এ মাসের ফযীলত অর্জনে সচেষ্ট হওয়া মু মিনের কর্তব্য। অবশ্য অপেক্ষাকৃ ত কিছু টা দু র্বল সনদে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, যখন রজব মাস শুরু হতো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের দু ‘আটি (অধিক পরিমাণে) পাঠ করতেন। দু ‘আটি এই, اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তু মি আমাদের জন্য রজব ও শা'বান মাসে বরকত দাও এবং আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত পেঁ ৗছে দাও। (মু সনাদে আহমাদ- ১/২৫৯, মু সনাদে বায্‌যার, দ্র. মাজমাউয যাওয়ায়েদ- ২/১৬৫)

যেহেতু বর্ণিত দু ‘আটি ছাড়া এ মাসের আর কোন বিশেষ ইবাদত প্রমাণিত নেই তাই নিজ থেকে এ মাসের মনগড়া কোন বিশেষ ইবাদত বা তার বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং সেটাকে সু ন্নাত বা মু স্তাহাবের সমান গুরুত্ব দেয়া বিদ‘আত হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইসলাম-পূ র্ব জাহেলী যু গে যেমনিভাবে এ রজব মাসকে নিয়ে ছিল বিশেষ মাতামাতি, তেমনি বর্তমানেও এর ব্যতিক্রম নয়।

জাহেলী যু গে রজব মাস

আইয়ামে জাহিলিয়াতে রজব মাস পালিত হতো বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ ও আচার-অনু ষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এ মাসের মর্যাদা রক্ষার্থে তারা যু দ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ রাখতো, কেউ কেউ রোযাও

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে এ সব রসম-রেওয়াজে পরিবর্তন আনেন ও সংস্কার সাধন করেন। ঘোষণা করেন, لا فرع ولا عتيرة অর্থাৎ ইসলামে ‘ফারা’ (উট বা বকরীর প্রথম বাচ্চা প্রতিমার উদ্দেশ্যে) জবাই করে উৎসর্গ করার কোন প্রথা নেই এবং ‘আতীরা’ (রজব মাসে প্রতিমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে) পশু জবাই করার প্রথাও নেই। (বু খারী শরীফ; হাদীস ৫৪৭৪)

রজব মাসের ‘আতীরা’ প্রথা ছাড়াও অন্যান্য রসম-রেওয়াজকেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাজ-কর্মের মাধ্যমে সংশোধন করে গেছেন।

কিন্তু আফসোস! বর্তমানে তাঁ র কিছু উম্মত দীনের নামে নিত্য নতু ন রসম-রেওয়াজ ও কু সংস্কার এ মাসে চালু করছে। যেমন, রজব মাসের বিশেষ পদ্ধতির নামায, বিশেষ রোযা, শবে মি'রাজের বিশেষ নামায ও বিশেষ রোযা এ ছাড়াও কত কী! নিম্নে আমরা এ মাসে পালিত কিছু কু প্রথা ও কু সংস্কার নিয়ে আলোকপাত করব।

রজব মাসের বিশেষ নামায ও রোযা

শরীয়তের একটি মূ লনীতি হল, কোন দিন বা রাতের বিশেষ ফযীলত প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটা জরুরী নয় যে, সে সময়ের বিশেষ কোন ইবাদত থাকতে হবে; বরং বিশেষ কোন সময়ে বিশেষ কোন ইবাদতকে সু ন্নাত বা মু স্তাহাব বলতে হলে তার স্বপক্ষে স্বতন্ত্র দলীল থাকা জরুরী। অনু রূপভাবে কোন সময়ের মধ্যে সাধারণ কোন নামায প্রমাণিত থাকলে সে নামাযের বিশেষ কোন পদ্ধতি নিজের পক্ষ থেকে সু ন্নাত বা মু স্তাহাব বলতে গেলেও তার জন্য স্বতন্ত্র দলীল থাকা জরুরী। কারণ, ইবাদতের বিয়ষটি একমাত্র ওহী দ্বারা প্রমাণযোগ্য। কিয়াস

বা বিবেক-বু দ্ধি দ্বারা কোন ইবাদত ও তার ধরন নির্ধারণের অবকাশ শরীয়তে নেই। (আল-ই'তিসাম- ১/৪৪৫, ইখতিলাফে উম্মত; পৃ ষ্ঠা ১০৯-১২৭)

পূ র্বেই বলা হয়েছে, রজব মাসের বিশেষ কোন ইবাদত প্রমাণিত নেই। তাই নিজ থেকে মনগড়া কোন বিশেষ ইবাদত বা তার বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করে সেটাকে সু ন্নাত বা মু স্তাহাব মনে করা বিদ'আত; যা নিতান্তই গর্হিত ও বর্জনযোগ্য।

অথচ বর্তমান বাজারে বহু বই পু স্তক পাওয়া যায়, যেগুলোতে রজব মাসের বিশেষ পদ্ধতির নামায ও নির্দিষ্ট তারিখে রোযা রাখার ফযীলত সম্বলিত বহু রেওয়ায়েতের উল্লেখ রয়েছে। বস্তুতঃ এইসব রেওয়ায়েতই জাল, ভিত্তিহীন ও বাতিল। অথবা সনদের বিচারে এত দু র্বল যে তা দ্বারা না কোন হুকু ম প্রমাণ করা যায়, না কোন আমল প্রমাণিত হয়।

যেমন, সেসব কিতাবে একটি বিশেষ নামাযের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে পদ্ধতি হলো, রজব মাসের প্রথম তারিখ মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ রাকাআত নফল নামায এ নিয়মে পড়া যে, দু ই দু ই রাকাআত করে দশ সালামে বিশ রাকাআত নামায পড়া হবে। প্রত্যেক রাকাআতে সূ রা ফাতেহার সাথে সূ রা ইখলাস তিনবার ও সূ রা কাফিরূন তিনবার পাঠ করবে।

এ নামাযের ফযীলত হল, যে কোন মু মিন নর-নারী এ নামায পড়বে তার যাবতীয় গুনাহ মাফ কিংবা গুনাহগারদের দফতর থেকে তার নাম কাটা যাবে। এবং কিয়ামতের দিন তাকে শহীদগণের দলভু ক্ত করে উঠানো হবে। লাগাতার হাজার বছর ইবাদতকারী আবেদগণের নামের তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ করা হবে এবং বেহেশতে তাকে এক হাজার মর্তবা দান করা হবে।

প্রিয় পাঠক! বর্ণিত রেওয়ায়েতসহ এ বিষয়ে বর্ণিত সকল রেওয়ায়েত সম্পূ র্ণ ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও জাল। কাজেই কারো জন্য এগুলোকে রাসূ লের হাদীস মনে করে আমল শুরু করে দেয়া জায়েয হবে না।

পূ র্বেই বলা হয়েছে, রজব মাস আশহুরে হুরুমের অন্তর্ভু ক্ত হওয়ায় এ মাসে নিয়মিত আমলগুলোই অধিক পরিমাণে ও অধিক যত্ন সহকারে আদায় করা উচিৎ। আর নফল রোযাও যেহেতু নিয়মিত একটি আমল, তাই এ মাসে সাধারণভাবে নফল রোযাও অধিক পরিমাণে রাখা ভাল। যেমন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসে ও অপর তিন মাসে মাঝে মধ্যে নফল রোযা রাখতেন বলে হাদীসে বর্ণিত আছে। (সু নানে আবু দাউদ; হা. ২৪২৮, সু নানে ইবনে মাজাহ; হা. ১৭৪১)

তবে মনে রাখতে হবে বিশেষভাবে এ মাসের নির্দিষ্ট কোন তারিখে রোযার কোন ভিত্তি নেই। এ সংক্রান্ত যে সকল বর্ণনা ঐসব বাজারী পু স্তকসমূ হে পাওয়া যায় সে সবই জাল, বাতিল ও বানোয়াট। এ ধরনেরই একটি বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করছি।

'রজব মাসে এমন একটি দিন ও তিনটি রাত আছে, যেই দিনে যদি কেউ রোযা রাখে এবং যেই রাতগুলোতে যদি ইবাদত করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে শত বছরের রোযার এবং শত বছরের রাত্র জাগরণের পু ণ্য দান করে থাকেন। ঐ রাতগুলো হল, রজব মাসের শেষ তিন রাত। আর ঐ দিনটি হল, হযরত মু হাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবু ওয়াত প্রাপ্তির দিন।'

রজব মাসের এ রোযার ফযীলত সংক্রান্ত রেওয়ায়েতসমূ হকে মোল্লা আলী কারী রহ. হাফেযে হাদীসগণের বরাতে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। (মিরকাত ৪/৪৬৭) এ ছাড়াও অন্যান্য মু হাদ্দিসগণ অনু রূপ মন্তব্য করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য *লাতায়েফু ল মা'আরেফ; পৃ ষ্ঠা* ১৩১, ইবনে রজব হাম্বলী কৃ ত। *ফাতহুল মু লহিম* ৩/১৭৫, শাব্বীর আহমাদ উসমানী কৃ ত।

শবে মি'রাজ নিয়ে বিভ্রান্তি

কোন কোন পু স্তক-পু স্তিকায় স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে এবং জনসাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ আছে যে, রজব মাসের ২৭ তারিখে মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অথচ বাস্তব কথা হল, এ কথাটি শুধু একটি ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে জনসাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যার সনদ বিশুদ্ধ নয়। অন্যথায় এটি কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস বা কোন সাহাবীর উক্তি দ্বারাও প্রমাণিত নয়। এ ঘটনাটি কোন বছর কোন মাসের কোন তারিখে এবং কোন রাতে ঘটেছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। কোন কোন বর্ণনা থেকে বোঝা যায় মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসে। কোন কোন রেওয়ায়েতে রজব মাসে আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে অন্য মাসের কথাও বর্ণিত রয়েছে। এর মধ্যে নির্ভরযোগ্যসূ ত্রে শুধু এতটু কু ই পাওয়া যায় যে, মি'রাজের ঘটনা হিজরতের এক বা দেড় বছর পূ র্বে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু সু নির্দিষ্ট মাস, দিন, তারিখের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই। এ কারণে পূ র্ণ নিশ্চয়তার সাথে কোন একটি তারিখকে সঠিক বলে অন্যগুলোকে ভু ল বলা যাবে না। বিশেষত ২৭ শে রজব সম্পর্কে জনমনে মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে যে ধারণা জন্মেছে এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ইমাম ইবরাহীম হারবী রহ. ও ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেছেন, এ রাতে মি'রাজ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত নয়। (লাতায়েফু ল মা'আরেফ; পৃ ষ্ঠা ১৩৪)

শবে মি'রাজের রসম ও বাস্তবতা

পূ র্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, শবে মি'রাজের তারিখ সু নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি। অথচ অনেকেই ২৭ শে রজবকে শবে মি'রাজ সাব্যস্ত করে সে রাতটিও ঐ ভাবে কাটাতে হবে বলে মনে করেন, যেভাবে কদরের রাত কাটানো হয়। অনেকেই আবার এ রাতে বিশেষ পদ্ধতির নামায ও পরদিন রোযা রাখাকে ইবাদত মনে করেন। অথচ বাস্তব কথা হল, শবে মি'রাজের কোন ইবাদত বন্দেগীর ব্যাপারে কোন ফযীলত কু রআন-হাদীসে প্রমাণিত নয়। ঐ রাতে বিশেষ কোন ইবাদত ও পরদিন বিশেষ কোন রোযার বিধান থাকলে তা অবশ্যই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হতো এবং সাহাবা ও তাবেঈগণ তা করতেন। কিন্তু এমন কোন কিছু পাওয়া যায় না। তাছাড়া মি'রাজের ঘটনা হিজরতের পূ র্বে সংঘটিত হয়েছিল এবং এরপরও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তত এগার বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু হাদীস শরীফের কোথাও এমন প্রমাণ নেই যে, তিনি কখনো এ রাত উদযাপন করেছেন বা করতে বলেছেন অথবা পরদিন রোযা রেখেছেন বা রোযা রাখতে বলেছেন। এমন কি অনেক আলেম বলেছেন, মি'রাজের রাত নিঃসন্দেহে একটি বরকতময় রাত ছিল। কিন্তু এই রাতে যেহেতু বিশেষ কোন আমল বা

ইবাদত উম্মতের জন্য বিধিবদ্ধ হয়নি তাই এর দিন তারিখ সু নির্দিষ্টভাবে সংরক্ষিত থাকেনি। (আল-মাওয়াহিবু ল লাদু ন্নিয়্যাহ ৮/১৮, ১৯, আল-বিদায়া ২/৪১৭, লাতাইফু ল মা'আরিফ; পৃ ষ্ঠা ১৩৪, ইসলাহী খু তু বাত ১/৪৬-৪৮)

প্রকৃ ত সত্য হল, মি'রাজের রাত পৃ থিবীর ইতিহাসে একবারই এসেছিল। কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনো মি'রাজ সংঘটিত হবে না। এমন বাস্তবতায় শবে মি'রাজ নামে ধারণার ভিত্তিতে কোন একটি রাত নির্দিষ্ট করে সে রাতে বিশেষ ইবাদত করা, পরদিন শবে মি'রাজের রোযা রাখা শরীয়তের দৃ ষ্টিতে বিদ'আত ও কু সংস্কার।

মোটকথা, ঐ রাতে বিশেষভাবে ইবাদতে মশগুল হওয়া, দিনে রোযা রাখা, এ উদ্দেশ্যে মসজিদে ভীড় জমানো, রাত্রি জাগরণ করা, মসজিদে আলোকসজ্জা করা, বিশেষ বয়ানের আয়োজন করা, বাড়ী বাড়ীতে মীলাদ পড়া, এ উপলক্ষে হালু য়া-রুটির ব্যবস্থা করা, সরকারিভাবে এ রাত উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া, প্রচার মাধ্যমে বিশেষ অনু ষ্ঠান প্রচার করা, পত্র-পত্রিকায় বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করা ইত্যাদি কোনটিই সহীহ নয়। বরং বছরের অন্যান্য রাত ও দিনের ন্যায় স্বাভাবিক ইবাদত-বন্দেগী করাই আমাদের ঐ রাত ও দিনের কর্তব্য। (আমালু স সু ন্নাহ; পৃ ষ্ঠা ১২২, ১২৩)

আজমীর শরীফের ওরস

হিজরী ৬২৭ সালের রজব মাসে হযরত খাজা মু ঈনু দ্দীন চিশতী রহ. মৃ তু্যবরণ করেছেন। ভারতের আজমীরে তার কবর রয়েছে। এটাকে ভিত্তি করে প্রতি রজব মাসে তার কবর কেন্দ্রিক ওরস হয়ে থাকে। আর বর্তমানে সকলেরই জানা যে, ওরস মানেই হল অশ্লীলতা, নাচগান, বাদ্য, পর্দাহীনতা ও অসংখ্য বিদ'আতী ও শিরকী কর্মকাণ্ড। এছাড়া সেখানে এমন অনেক পশু জবাই করা হয় যেগুলো মূ র্খ লোকেরা হযরত খাজা রহ. এর মাযারের নামে মান্নত করে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মান্নত করা –চাই তা কোন পীর বু যু র্গের নামেই হোক– সম্পূ র্ণ শিরক। ওরস উপলক্ষে মাযার কেন্দ্রিক যে সকল শিরক, নাজায়েয কর্মকাণ্ড ও অশ্লীলতা হয়ে থাকে সেগুলো যদি নাও হতো তবু ও তো ওরস করা শরীয়তের দৃ ষ্টিতে নিষিদ্ধ। কারণ, ওরসের অর্থই হল উৎসব। আর খোদ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে তাঁ র রওযা মু বারকেও উৎসব পালন করতে নিষেধ করেছেন। (সু নানে আবু দাউদ; হাদীস ২০৪০, আউনু ল মা'বূ দ ৬/২৩) অতএব অন্য আর এমন কে আছেন যার কবরে ওরস করা জায়েয হবে?

খাজা আজমেরীর ডেগ

রজব মাসে হাজার হাজার মাইল দূ রে আজমীরে ওরস হবে তার ঢেউ আছড়ে পড়ে উপমাহদেশের সর্বত্র। বিশেষত আমাদের বাংলাদেশে এ উপলক্ষে মাযার ভক্তরা প্রতি বছর গোটা দেশের মাযারগুলোতে যে সমস্ত শিরকী বিদ'আতী ও অশ্লীল কর্মকাণ্ড করে থাকে তার সামনে আইয়ামে জাহিলিয়াতের অপকর্মও বু ঝি ম্লান হয়ে যায়। ঢোল-তবলা ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নাচ-গানের আসর জমানো হয় সেখানে। কোন কোন স্থানে নারী-পু রুষের মেলা-মেশা হয় অবাধে। অথচ এ সবই নাজায়েয ও হারাম। যতই দিন যাচ্ছে ততই এগুলোর বাজার গরম হচ্ছে। (আল্লাহর পানাহ) মজার ব্যাপার হল, এসব হারাম কর্মকাণ্ডের অর্থ যোগান দেয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, অলিতে গলিতে স্থাপন করা হয় লালসালু তে জড়ানো বিরাট বিরাট আজমেরী-ডেগ। উদ্দেশ্য, যেন এগুলোতে মান্নত আর নযর-নিয়াযের পয়সা ফেলা হয়। এসব পয়সা কোথায় যায়? সে প্রশ্নের উত্তর হয়ত অনেকেরই জানা আছে। তবে এখানে বোঝার বিষয় হল, এসব ডেগে টাকা-পয়সা দেয়া হারাম। ঐ টাকা-পয়সা দিয়ে যেসব খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করা হয় তা খাওয়াও হারাম। কারণ, পূ র্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, মাযার ও মাযারওয়ালার নামে মান্নত করা নির্ভেজাল শিরক। মান্নত শুধু আল্লাহর নামেই হতে পারে; অন্য কারো নামে নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

লেখক :
প্রধান মু ফতী ও সিনিয়র মু হাদ্দিস, জামি'আ ইসলামিয়া বাইতু ন নূ র, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। খতীব, মগবাজার ওয়্যারলেস গেট চৌরাস্তা জামে মসজিদ।

বিসমিহী তা'আলা

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ.) কর্তৃক ভারতের জেলা শহর লক্ষ্ণৌর 'হারদুইয়ে' প্রতিষ্ঠিত ইলমে কিরাআতের মারকাযের অনুসরণে বাংলাদেশের ঢাকা, মুহাম্মদপুরে তাকওয়া মাদরাসায় ট্রেনিং চলছে।

হারদুই তরযে নূরানী তা'লীমুল কুরআন ও মু'আল্লিম ট্রেনিং

পূর্ণ ট্রেনিং কোর্সের মেয়াদ তিন মাস (বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে সক্ষমদের জন্য দেড় মাস)

স্থান : তাকওয়া মাদরাসা

বাসা নং ২২৭, রোড নং ০৭, মুহাম্মদী হাউজিং লিমিটেড,

মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

ভর্তির সময় নিম্নে বর্ণিত তথ্যাদি সঙ্গে আনতে হবে।

১. প্রতি কোর্স শুরু হওয়ার ১০ দিনের মধ্যে ভর্তি হতে হবে।

২. জাতীয় পরিচয়পত্র (যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র নেই তাদের জন্য নিজ এলাকার কমিশনার/চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র)।

৩. জন্ম নিবন্ধন সনদ।

নিম্নবর্ণিত সময়ে প্রতিবছর চারটি ট্রেনিং কোর্স চলবে

১লা ডিসেম্বর থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী।

১লা মার্চ থেকে ৩০ মে।

১লা জুন থেকে ৩০ আগস্ট।

১লা সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর।

যারা বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত শিখতে আগ্রহী এবং যারা মু'আল্লিম হতে চান উভয় প্রকার লোকই এখানে ভর্তি হতে পারেন। এই কোর্সের মাধ্যমে আপনি বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবেন এবং অন্যকে নূরানী পদ্ধতিতে বিশুদ্ধভাবে কুরআন শেখানোর যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

আসন সংখ্যা সীমিত। ইমাম, মুআযযিন ও আলেমদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

সার্বিক যোগাযোগ
ক্বারী মুহাম্মদ নাজিমুদ্দীন
মোবাইল : ০১৯১৩০৪১২১৯

মুতাওয়াল্লী বোর্ডের পক্ষে
মুফতী মনসূরুল হক
প্রধান মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মোবাইল : ০১৭১২৭৯৭১৮১

গ্রন্থ পরিচিতি

রিয়াযু স সালিহীন

মাওলানা আব্দু র রাজ্জাক

লেখক পরিচিতি

বিখ্যাত এই গ্রন্থের লেখক প্রখ্যাত মু হাদ্দিস আল্লামা মু হিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আন-নববী রহ.। তিনি ইমাম নববী নামেই অধিক পরিচিত।

৬৩১ হিজরী মোতাবেক ১২৩৩ খ্রিস্টাব্দে ১০ মু হাররম দামেশকের হুরান এলাকার নাওয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই লেখাপড়ার প্রতি ছিল তার অকল্পনীয় আগ্রহ ও আকর্ষণ। খেলাধু লার প্রতি তার কোন আগ্রহ ও ঝোঁ াক ছিল না। খেলাধু লার জন্য কেউ তাকে পীড়াপীড়ি করলে তিনি কান্নাকাটি শুরু করতেন। লেখাপড়ার প্রতি তিনি যেমন অধিক আগ্রহী ছিলেন তেমনি ছিলেন অত্যধিক মেহনতী ও প্রখর মেধার অধিকারী। স্বল্প বয়সেই হিফযু ল কু রআন সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি তৎকালীন যু গশ্রেষ্ঠ আলেমগণ হতে হাদীস, ফিক্‌হ, উসূ ল ও ভাষা বিষয়ে পাণ্ডিত্য লাভ করেন। আল্লামা কাযী ইমাদু দ্দীন, আব্দু ল কারীম ইবনু ল খু রাসানী, শরফু দ্দীন আব্দু ল আযীয আদ-দিমাশকী, কামালু দ্দীন আবু ইবরাহীম, ইসহাক ইবনে আহমদ, আব্দু র রহমান আ-জীয়ানী, উমর ইবনে বু নদার আত-তাফলীসী প্রমু খ বিশ্ববরেণ্য ও জগদ্বিখ্যাত আলেমগণ ছিলেন তাদের অন্যতম। এ সকল শাইখ থেকে তিনি অনেক কিতাবের পাঠ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, *আত-তামবীহ, আল-মু হায্‌যাব, আল-ওয়াসীত* ও *আল-জাম্‌উ বাইনাস সহীহাইন* ইত্যাদি।

প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষে তিনি তা'লীম-তাদরীসের কাজে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করেন। এ সময় তিনি হাজার হাজার ইলম পিপাসু ছাত্রকে ইলমী সু ধায় সিক্ত করেন। তারই হাতে গড়ে ওঠেন আল্লামা আবু ল হাসান ইবনু ল আত্তার, ইমাম মিয্‌যী, আবু ল আব্বাস ইশবিলী, আবু ল আব্বাস আল-খাল্লাল, বদরুদ্দীন ইবনু ল জামা'আর মত বিদগ্ধ ও বিখ্যাত আলেমগণ।

তিনি এতটাই ইলমঅনু রাগী ও খোদাভীরু ছিলেন যে, রাত-দিনের ২৪ ঘন্টার প্রতিটি মু হূ র্তে হয়তো লিখতেন নয়তো পড়তেন বা পড়াতেন নতু বা কোন ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। খানা-পিনা খু ব কম করতেন। শুধু রাতে ইশার পর সামান্য খাবার খেতেন। আর সাহরীর সময় সামান্য পানি পান করতেন। ভাবতেও অবাক লাগে যে, তার ইলম পিপাসা কত প্রচণ্ড ছিল যে, এতে ব্যাঘাত ঘটার আশঙ্কায় তিনি সারাজীবন বিবাহই করেননি।

ইলমের জন্য এমন সব অত্যাশ্চর্য কু রবানীর ফলে আলোচ্য গ্রন্থটি ছাড়াও তিনি উম্মাহকে উপহার দিয়েছেন এমন সব বিরল গ্রন্থরাজি, কিয়ামত পর্যন্ত যার জু ড়ি মেলা ভার। তন্মধ্যে *সহীহ মু সলিম* এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ *আল-মিনহাজ, মু হায্‌যাব* এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ *আল-মাজমূ ', তাহযীবু ল আসমা ওয়াল লু গাত, ওয়াসীত* এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ *আত-তানকীহ, শরহু সু নানে আবী দাউদ, আত-তাহকীক, আত-তাবাকাতু শ শাফিইয়্যা, আত-তাকরীব* ইত্যাদি তার রচনাবলীর অন্যতম।

ইলমের জন্য উৎসর্গিত ও উম্মাহর খেদমতে নিবেদিত প্রাণ এই মহামনীষী ৬৭৬ হিজরী মোতাবেক ১২৭৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করে রব্বে কারীমের কাছে চলে যান।

রিয়াযু স সালিহীন ও তার বৈশিষ্ট্যাবলী

'রিয়াযু স সালিহীন' এক খণ্ডের এই গ্রন্থটি আল্লামা নববীর এক অনবদ্য হাদীস সংকলন। এতে তিনি ১৮৯৬টি হাদীস সংকলন করেছেন। এতে তিনি ঐ সকল হাদীস সংকলন করেছেন যা মু মিন বান্দাদেরকে পরকালীন পাথেয় প্রস্তুত করতে উৎসাহ যোগায়, আদাবে বাতিনা ও আদাবে যাহিরী অর্জনের পথ দেখায় এবং উসওয়ায়ে রাসূ ল তথা রাসূ ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শে আদর্শবান হতে উদ্বু দ্ধ করে। যেমন, আল্লামা ইবনে আল্লান বলেন,

أنه قد جمع ما يحتاج إليه السالك في سائر الأحوال، واشتمل على ما ينبغي التخلق به من الأخلاق والتمسك به من الأقوال والأفعال. مغترفاً له من عباب الكتاب والسنة النبوية، ناقلاً لتلك الجواهر من تلك المعادن السنية.

'একজন আল্লাহ অভিমু খী বান্দা প্রতিটি মু হূ র্তে যা কিছু র প্রয়োজন বোধ করে তার সবই তিনি এখানে সংকলন করেছেন। যে সকল গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব কথা ও কাজ মজবু তির সাথে অনু সরণ করা উচিৎ সেগুলোর উপর কিতাবটি পূ র্ণ ব্যাপৃ ত, যা কিতাবু ল্লাহ ও সু ন্নাতে নববীর শ্রেষ্ঠ অংশ হতে চয়িত এবং এর সকল মনি-মু ক্তা ঐ উন্নত ভাণ্ডার হতে সংগৃ হীত।'

আল্লামা হাজী খলীফা বলেন,

هو مختصر جمعه من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة جامعا للترغيب والترهيب والزهد ورياضات النفوس.

'এটি সহীহ হাদীসসমূ হের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। এতে আখেরাতের প্রতি পথ প্রদর্শনকারী, নেককাজে উৎসাহদানকারী, গুনাহের প্রতি ভীতি প্রদর্শনকারী, দু নিয়া বিমু খতা এবং আত্মশুদ্ধি অনু শীলন বিষয়ক হাদীসসমূ হ স্থান পেয়েছে।'

মোটকথা, তারগীব-তারহীবমূ লক ও আল্লাহর পথের পথিকের সর্বপ্রকার আদাব বিষয়ক হাদীসের এ এক অনু পম গ্রন্থ। এর বর্ণনা-বিন্যাস এতই সহজ ও সাবলীল যে, সর্বশ্রেণীর মু সলমানই এটি অল্প সময়ে আয়ত্ত ও আত্মস্থ করতে সক্ষম। হাদীসগুলোকে তিনি ১৯টি অধ্যায়ে ৩৭২টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন। প্রতিটি অধ্যায় শুরু করেছেন সংশ্লিষ্ট আয়াত দ্বারা। আর প্রতিটি হাদীসের উদ্ধৃ তি উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেননি। উপরন্তু যেসব শব্দে হরকত রয়েছে সেগুলোর সহীহ হরকত কী হবে তা অতি যত্নের সাথে উল্লেখ করেছেন এবং জটিল ও কঠিন শব্দগুলোর প্রয়োজনীয় অর্থ ও ব্যাখ্যা

খু ব সু ন্দরভাবে তু লে ধরেছেন। ইন্তিকালের ছয় বছর পূ র্বে ৬৭০ হিজরীর ১৪ রমাযান সোমবার এই গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্ত করেন।

বিষয়বস্তু অধিক গুরুত্বপূ র্ণ হওয়ার পাশাপাশি ব্যাপক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার ফলে 'রিয়াযু স সালিহীন' বিশ্বময় পরিচিত ও অধিক সমাদৃ ত একটি গ্রন্থ। বাংলা ভাষাসহ বিশ্বের বহু ভাষায় অনু দিত হয়ে গ্রন্থটি সর্বমহলে সমাদৃ ত হয়েছে। **(২৩ নং পৃ ষ্ঠায়)**

পানি নয়! মরীচিকা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯) দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে ধরা দেয়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমন কিছু হতভাগা জীবনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন ॥

সুখী পরিবারের সুখ

আজকাল সন্তানাদি বেশী হওয়াকে মনে করা হয় ঝামেলা ও অশান্তির কারণ। উন্নতি ও অগ্রগতির অন্তরায়। চার পাঁচটা সন্তানের জনক জননীদের ধারণা করা হয় হয় মূর্খ ও অসামাজিক। "দু'টি হলে আর নয়, একটি হলে ভালো হয়" শ্লোগানটি যেন আধুনিক সমাজে ঈমানী কালেমা। এ কালেমায় বিশ্বাস না করলে যেন আধুনিক হওয়া যায় না। সুতরাং প্রথমটি যদি পুত্র সন্তান হয় "একটি হলে ভালো হয়" এ অনুযায়ীই আমল করেন অনেক পরিবার। আর যদি প্রথমটি কন্যা সন্তান হয় তাহলে পুত্রের আশায় আরেকবার ট্রাই করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের অনেকের আশাই পূরণ করেন। ফলে তারা তৃতীয় অতিথির আগমনের সকল পথ বন্ধ করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। আর যদি দ্বিতীয়টিও কন্যা সন্তান হয় তাহলে সংক্ষেপে আফসোস করেন এবং আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট হয়ে অপরের পুত্রের আগমনের ইন্তেজারকেই শেষ সম্বল হিসেবে গ্রহণ করেন। সকলেরই স্বপ্ন সুখী সংসার, শান্তিময় ভবিষ্যত। কিন্তু শরীয়ত উপরোক্ত চিন্তাধারাকে সমর্থন করে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...

অর্থ- সম্পদ ও সন্তান পার্থিব জীবনের শোভা...। (সূরা কাহাফ-৪৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, تزوجوا الودود الولود

অর্থ : তোমরা অধিক সোহাগি ও অধিক সন্তান জন্মদানকারী নারীদের বিবাহ কর। (সুনানে আবু দাউদ; হাদীস ২০৫০)

আল্লাহ ও রাসূলের কথায় স্বল্পজ্ঞানীদের যতই আপত্তি থাক না কেন, ঈমানদারদের এ কথা মানতেই হবে যে, কম সন্তান সুখ ও শান্তির কারণ এ কথা মোটেও সত্য নয়। এ কথা ঠিক যে, সন্তান দেয়া-নেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কিন্তু মুমিনের চাওয়া ও চেষ্টা সন্তান কমানোর জন্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়; যদি কোন ওযর না থাকে।

আমাদের আধুনিক ভাইয়েরা "সম্পদ পার্থিব জীবনের শোভা" আল্লাহ তা'আলার এ কথায় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী বিশ্বাসী। কিন্তু সন্তানের ক্ষেত্রে বিশ্বাস করে ইবলিসের ওয়াদায়। জীবনে এ দ্বৈত নীতি গ্রহণের ফলে এদের অধিকাংশকেই আল্লাহ তা'আলা সন্তান-কেন্দ্রিক এমন শান্তি (!) দান করেন যে, এক সময় শিরায় শিরায় টের পেয়ে যায় যে, শান্তি (!) কাকে বলে ও তা কত প্রকার! এ বিভাগে এমনই কয়েকটি সুখী (!) পরিবারের ঘটনা উল্লেখ করা হবে, যেগুলো থেকে আশা করি পাঠক মহল অনুভব করতে পারবেন যে, প্রকৃত সুখ মানব রচিত নীতিতে নয়।

ক. ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি। আসর নামায শেষে মসজিদে বসে আছি। মসজিদে খুব একটা দেখা যায় না এমন একজন বলল, হুযুর! দয়া করে যদি আমার বাসায় একটু আসতেন, আমার ছেলেটাকে একটু দু'আ করে দিতেন। বললাম, আপনার ছেলের কী হয়েছে? বলল, দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরেও নিয়ে গেলাম। কিন্তু দিন দিন অবস্থার অবনতি হচ্ছে। কোন হাসপাতালে রাখার মত সামর্থ্যও আর নেই। রেখে লাভও নেই। বললাম, আমি মুসল্লীদেরকে নিয়ে দু'আ করে দেবো ইনশাআল্লাহ। বলল, আমার আর্জি, আপনি যদি একটু বাসায় আসতেন। কারণ তার অবস্থা মুখে বলে বোঝানোর মত নয়। বলতে বলতে চোখ মুছতে শুরু করল। বুঝলাম, নিশ্চয় ব্যতিক্রম কিছু, আমার যাওয়া উচিৎ। তাই কথা দিলাম আগামীকাল আসবো ইনশাআল্লাহ।

পরদিন বাদ যোহর এক মুসল্লী ভাইকে সাথে নিয়ে তার বাসায় গেলাম। দরজা নক করতেই ভিতর থেকে মেয়েলী কণ্ঠের প্রশ্নের উত্তরে বললাম, আমি ইমাম সাহেব, আপনাদের অসুস্থ সন্তানকে দেখতে এসেছি। ভাইজান বাসায় আছেন কি? ভদ্র মহিলা বললেন, তিনি দোকানে কেনাকাটার জন্য গেছেন। আপনারা ভিতরে আসেন। বললাম, পরে আসবো, আমরা এখন চলে যাই। তিনি বললেন, প্লিজ! যাবেন না, আমার ছেলেটাকে দেখে যান। আমি পর্দা করেই তাকে দেখিয়ে দেবো। এই বলে বড় ওড়নায় সাধ্যমত নিজেকে আবৃত করে দরজা খুলে দিলেন। আমাদেরকে নিয়ে গেলেন ছেলের রুমে। ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম, হাসপাতালের একটা অটোবেড। চাকা লাগানো পায়া, স্যালাইন ইত্যাদি পুশ করার জন্য খুঁটি। ইচ্ছা করলে বেডটি উঁচু-নিচু করা যায়। তার উপরে চাদরের নীচে গোলাকার কী যেন পড়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার ছেলে কোথায়? মহিলা চোখ মুছতে মুছতে চাদরটি যেই উঠালো, আমরা এমন এক দৃশ্য দেখলাম যা মনে পড়লে আজও শরীর শিউরে ওঠে। ছেলেটা উল্টো দিকে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে মাথাটা দু' পায়ের কাছাকাছি গিয়ে বৃত্তের মত নিথর পড়ে আছে। দৃষ্টি জমানোর সাহস পেলাম না। বললাম, ঢেকে দিন। জিজ্ঞেস করলাম, ওর কী অসুখ হয়েছে? বললেন, আমাদের একটি মাত্র সন্তান। আট বছর বয়স। খেলা-ধুলা, খাওয়া-দাওয়া, পড়াশোনা সব ঠিকঠাকভাবে চলছিল। মাত্র ছয় মাস আগে ব্রেইন টিউমার ধরা

পড়ল। প্রথমে বলত মাথা ব্যথা। এরপর আস্তে আস্তে অস্বাভাবিক আচরণ। দেশীয় কয়েকজন ডাক্তার দেখিয়ে কোন সুফল না পেয়ে নিয়ে গেলাম সিঙ্গাপুর। কোন সফলতা নেই। অবনতির পর অবনতি। আশাহত হয়ে দেশে চলে আসি এবং ডাক্তারদের পরামর্শে ঘরেই ক্লিনিক বানিয়ে নিয়েছি। তার চিকিৎসা করতে গিয়ে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। এখন সে চেতনাহীন পড়ে থাকে। বাবা-মা দু'জন পালাক্রমে ২৪ ঘন্টা পাশে বসে থাকি। তার বাবা চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। মমতাময়ী মা কথাগুলো বলছে আর কাঁদছে। আমরাও চোখের পানি রুখতে ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। জিজ্ঞেস করলাম, ২৪ ঘন্টা পাশে থাকতে হয় কেন? বললেন, ওর পেশাব-পায়খানায় সাহায্য করার জন্য। জিজ্ঞেস করলাম, পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হলে বোঝেন কীভাবে? বললেন, পেশাব-পায়খানার বেগ হলে সে নড়াচড়া শুরু করে। পেশাবের তুলনায় পায়খানার ক্ষেত্রে একটু বেশী নড়াচড়া করে। তখন আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করি। পেশাব তো সহজেই করিয়ে নিতে পারি। কিন্তু পায়খানার সময় ছোটখাটো কিয়ামত কায়েম হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ধরে একটু একটু করে পায়খানা করে আর আমরা টিস্যু পেপার দিয়ে তা মুছতে থাকি। তার নির্বাক ছটফট করা দেখে আমাদের বুক ফেটে যায়।

মোটকথা, এমনই এক করুণ কাহিনী যার প্রত্যক্ষদর্শী না হলে যে কারো বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে। আমরা সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেলাম না। রোগী দেখার দু'আ পড়ে বিদায় নিলাম। মসজিদে কয়েক নামাযের পর তার সুস্থতার জন্য দু'আও করলাম।

কিছু দিন পর মহান আল্লাহর অশেষ ফযলে হজ্জের সফর হল। মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানকালে একদিন আসরের নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীতে প্রবেশের সময় মোবাইলের রিং বেজে উঠল। রিসিভ করে দেখি, একজন অতি পরিচিত মুসল্লী ফোন করেছেন। সালাম-কালামের পর বললেন, হুযুর! অমুক বাসার অসুস্থ ছেলেটি আজ বিকালে মারা গেছে। শুনে ইন্না লিল্লাহ... ও আলহামদু লিল্লাহ দু'টোই পড়লাম। কারণ, মা-বাবা একমাত্র সন্তান হারিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে তিনটি সত্তাই এক সীমাহীন যাতনা থেকে মুক্তি পেয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ নিষ্পাপ সন্তানের উসীলায় মা-বাবা দু'জনকে পূর্ণ হিদায়াত নসীব করুন এবং উভয়কে পরকালে জান্নাত দান করুন। আমীন ॥

দু'আ করতে থাকলাম আর ভাবতে থাকলাম, স্বচ্ছল, সুখী এক দম্পতির কথা। বেশী সুখের জন্য হয়ত চার-পাঁচ বছর সন্তান গ্রহণ থেকেই বিরত থেকেছেন। অতঃপর প্রথম পুত্র সন্তান পেয়ে সীমাহীন সুখের জন্য আর ঝামেলা বাড়াতে চাননি। কিন্তু সে সুখ আট বছর অতিক্রম করেনি। সুখের স্বপ্নও গেল, স্বপ্নদ্রষ্টাদের সর্বস্বও কেড়ে নিল আর শেষ ছয় মাস কিয়ামতও দেখিয়ে গেল।

পাঠক, ভাবতে পারেন এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। প্রচলিত পরিবার পরিকল্পনার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু একটি বৃহৎ সমাজের সাথে জুড়ে আছি বলে ছোট্ট পরিবারগুলোর প্রায় সকলকেই সন্তানকেন্দ্রিক অশান্তির অনলে জ্বলতে দেখছি। আরও কয়েকটি ঘটনা আমি এ কলামে উল্লেখ করবো, যার প্রত্যেকটি আমার নিজ চোখে দেখা বা নিজ কানে শোনা। এ সকল ঘটনার আলোকে আমি নিশ্চিত যে বিনা কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দের বাইরে গিয়ে সুখ অর্জন কোনও দিন সম্ভব নয়। ইয়াহুদ, নাসারারা আমাদেরকে যে সুখ দেখাচ্ছে তা আসলে সুখ নয়; মরীচিকা।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

আবু তামীম

....

পরীক্ষায় সফলতা... (৪৬ পৃষ্ঠার পর)

(৫) পরীক্ষার দিনগুলোতে স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখবে। বেশী বেশী পানি পান করবে। পুষ্টিকর খানা খাবে। যেমন, দুধ, কলা, ফলমূল ইত্যাদি। এসব খাদ্য মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পড়া আয়ত্ত করা সহজ হয়। অবশ্য যেসব খাদ্য শরীরে উষ্ণতা সৃষ্টি করে সেগুলো সকালে বা দুপুরে খাবে, রাত্রে খাবে না। যাতে হিতে বিপরীত না হয়।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ইহ ও পরকালীন সকল পরীক্ষায় কামিয়াব করুন। আমীন ॥

লেখক :

মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

লেখা আহ্বান

উলামায়ে কেরাম, প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক বিশেষত আবনায়ে রাহমানিয়ার খিদমতে রাবেতার পক্ষে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। রাবেতার নিয়মিত বিভাগসহ দীন ও উম্মাহর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে লেখা পাঠানো যাবে।

শর্তাবলী

- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও মাসলাকে দেওবন্দের অনুকূল হতে হবে।
- সমসাময়িক বিষয় সংক্রান্ত লেখা অগ্রাধিকার পাবে।
- ফুলস্কেপ সাদা কাগজে পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।
- সম্পাদনার ক্ষেত্রে রাবেতার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।
- অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হবে না।
- রাবেতার ই-মেইলে, ডাকযোগে অথবা সরাসরি রাবেতার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে লেখা জমা দেয়া যাবে।

বি.দ্র. 'পাঠক মন্তব্য' কলামে পাঠকের মতামত/পরামর্শ/গঠনমূলক সমালোচনা পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।

পরীক্ষায় সফলতা লাভের উপায়

মাওলানা শফীকুর রহমান

ইলমে দীন শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যর্থতা বলতে কিছু নেই। ইলমে দীন অর্জনে চেষ্টা করতে পারাই অনেক বড় সফলতা। এ ইলমের সামান্য অংশ অর্জন করে যে নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে সেও এ দুনিয়ার সকল পণ্ডিত ও সকল সার্টিফিকেটধারীর চেয়ে অধিক সাফল্য অর্জন করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (অর্থ:) 'যে কুরআন শিখে ও অন্যকে শেখায় সে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (সহীহ বুখারী; হা. ৪৭৩৯) এতদসত্ত্বেও যেহেতু মহান রাব্বুল আলামীন কল্যাণকাজে প্রতিযোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেজন্য ইলমে দীন শিক্ষার্থীরাও ইলম অর্জনে প্রতিযোগী হয় এবং প্রতিযোগিতায় কেউ অগ্রণী হয়, আর কেউ পেছনে পড়ে যায়। বরকতময় এ প্রতিযোগিতায় সহপাঠিদের মধ্যে

সফলতা ও ব্যর্থতা জীবনঘনিষ্ট দু'টি শব্দ। প্রথমটি কাম্য ও প্রিয়। দ্বিতীয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রিয়। সাফল্য জীবনকে উজ্জীবিত করে। ব্যর্থতা জীবনকে গতিহীন করে দেয়। একটি সাফল্য অনেক সাফল্যের দ্বার খুলে দেয়। একটি ব্যর্থতা সুগম পথকেও দুর্গম করে তোলে। সঠিক পথ, সঠিক পদক্ষেপ, আত্মবিশ্বাস ও নিরন্তর সাধনা সাফল্যের চাবিকাঠি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, (তরজমা) 'আর যারা আমার পথে চেষ্টা-সাধনা করে অতিঅবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথ দেখিয়ে দেবো।' (সূরা আনকাবূত- ৬৯)

সাফল্যের পথে যারা নিয়ম মেনে চলে, মেধা, পরিবেশ, অর্থ প্রভৃতি প্রতিকূল হলেও আল্লাহ তা'আলা তাদের ভাগ্যে সাফল্য লিখে দেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'নিশ্চয়ই তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।' 'আমি কঠিনতম বিষয়কে তার জন্য সহজ করে দেবো।'...

সফলতা লাভের উপায় : জীবনে সফল হতে হলে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ১. আত্মবিশ্বাস ২. লক্ষ্য নির্ধারণ ৩. নিরন্তর সাধনা ৪. সঠিক কর্মপন্থা।

আত্মবিশ্বাস : নিজের ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া এবং সৎসাহসী হওয়া। 'ইনশাআল্লাহ আমি পারব' এই বিশ্বাস পোষণকারী পারেও বটে। 'আমি পারব' এটা সফল ব্যক্তির সফলতার সর্বপ্রথম পদক্ষেপ। তাই জীবনে সফল হওয়ার জন্য প্রতিটি ছাত্রকেই প্রথমে এ বিষয়টি আত্মস্থ করা জরুরী যে, 'আমি একজন মানুষ। সভ্যতার সবকিছু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দিয়ে করিয়েছেন। সুতরাং তিনি আমাকেও কাজে লাগাবেন।' বলা যায় সৎসাহস সকল সাফল্যের ভিত্তি। যারা পারবে বলে সাহস করে কুদরতে ইলাহী তাদের সহায় হয়। এভাবে সৎসাহস যুগে যুগে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসের গতিধারা পাল্টে দিয়েছে।

পক্ষান্তরে হীনমন্যতা, নিজের প্রতি আস্থাহীনতা আত্মবিকাশের পথে সবচে' বড় অন্তরায়। সম্ভাবনার পথে সবচে' বড় বাধা। মনোজাগতিক দাসত্বের সবচে' বড় শৃঙ্খল। সাফল্যের পথে দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধক।

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য : সফলতার দ্বিতীয় শর্ত হল, জীবনের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা। একজন ছাত্র যদি প্রথম হওয়াকে তার লক্ষ্য স্থির করে, তাহলে তার চেষ্টা-সাধনা, প্রস্তুতি সবকিছুই হবে সে পর্যায়ের। আর যে ছাত্র লক্ষ্যই স্থির করল, কোন রকমে পাশ করবো; তার পড়াশোনা, মেহনত-মুজাহাদা হবে তথৈবচ। কোন রকমে পড়া হয়ে গেলে সেটাকে সুন্দর থেকে সুন্দরতম করার ফিকির তার মধ্যে থাকে না। তাই লক্ষ্য বড় ও সুদূর প্রসারী হলে কোন কারণে বড়দের স্তরে সম্ভব না হলেও একটা নির্দিষ্ট স্তরে অবশ্যই তার পৌঁছা সম্ভব হয়।

লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনের তীব্র তাড়না, প্রয়োজনীয় গুণ, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা অর্জনের প্রতিটি সুযোগকে উস্তাদের তত্ত্বাবধানে কাজে লাগানো এবং রুটিন মাফিক চেষ্টা করারও বিরাট প্রভাব রয়েছে জীবনে সফল হওয়ার উপর।

নিরন্তর সাধনা : সফলতার তৃতীয় শর্ত হলো নিরন্তর চেষ্টা-সাধনা এবং মেহনত-মুজাহাদা। কোন ছাত্র যদি লক্ষ্যবস্তু নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট করে নিজের প্রতি আস্থাশীল ও বিশ্বাসী হয়ে যথার্থ মেহনত করে, তাহলে সে পরীক্ষায় অবশ্যই সফল হবে।

بقدر الكد تكتسب المعالي
ومن طلب العلى سهر الليالي

'চেষ্টা যেমন, মর্যাদা তেমন। যে উঁচু মর্যাদার প্রত্যাশা করে, সে (কষ্টকর হলেও) রাত্রি জাগরণ করে।' العطايا على متن البلايا 'সাধনার বাহনে সফলতার আসন।'

আসলে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মেধা দ্বারা কেউ জীবনে বড় হতে পারেনি। ইতিহাস সাক্ষী, পৃথিবীতে যারা বড় হয়েছেন তারা পরিশ্রম ও সাধনার গুণেই বড় হয়েছেন।

ড. আহমদ আমীন তার اصنع حياتك শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'অনেক তরুণের ভাবনা হলো, পৃথিবীতে এমন কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে চেষ্টা ছাড়াই শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখার, কষ্ট ছাড়াই আশ্চর্যজনক অবদান রাখার এবং যাদুদণ্ড দ্বারা মাটিকে স্বর্ণে পরিণত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এগুলো মূলত কাজ ও সাফল্যের সম্ভাবনা নষ্ট করার চিন্তা।'

সঠিক কর্মপন্থা : সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ এবং নিরন্তর সাধনা সত্ত্বেও যদি কর্মপন্থা সঠিক না হয়, তবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছা কখনই সম্ভব নয়। তাই লক্ষ্য নির্ধারণের পাশাপাশি সফলতা লাভে একজন শিক্ষার্থীর জন্য সঠিক কর্মপন্থা অবলম্বন অপরিহার্য।

পরীক্ষা : যোগ্য ও অযোগ্যের মাঝে পার্থক্য করা, খাঁটি ও ভেজালের মাঝে তারতম্য করা, সত্য ও অসত্যের মাঝে বিভাজন সৃষ্টি করা এবং ভাল-মন্দের যাচাই বাছাই করার হল পরীক্ষা।

সফলতার পথে তুমি কতটা আত্মবিশ্বাসী? লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনে তুমি কতটা অগ্রগামী? কর্মপন্থা এবং চিন্তা-চেতনা কতটুকু ইতিবাচক ও ফলদায়ক পরীক্ষা তা নির্ধারণ করে দিবে। এ জন্যই বলা হয়, عند الامتحان يكرم الرجل او يهان 'পরীক্ষা সম্মান ও অপমানের মানদণ্ড'।

পরীক্ষার ধারা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাঁর খাছ বান্দাদের পরীক্ষা নিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে, 'তারা ঐ সকল লোক, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা ও যাচাই করে নিয়েছেন তাকওয়ার জন্য। তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মহাপ্রতিদান।' (সূরা হুজুরাত- ৩) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাহাবায়ে কেরামের পরীক্ষা নিয়েছেন। *সহীহ বুখারী*তে বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন সে বৃক্ষ যার সাথে মানুষের সাদৃশ্য আছে? সকলেই চুপ রইলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তা হল খেজুর গাছ ... (সহীহ বুখারী; হা. ৭২)

পরীক্ষা ছাত্রদের যোগ্যতা বৃদ্ধি ও প্রতিভা বিকাশের একটি স্বার্থক মাধ্যম। পরীক্ষা না থাকলে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে উন্নতি সাধনের পথ পাওয়া যেতো না।

পরীক্ষা লক্ষ্য না উপলক্ষ? পরীক্ষাকে পড়া আয়ত্ত করার একটি বিশেষ উপলক্ষ মনে করতে হবে। পরীক্ষাকে পড়া-লেখার মূল লক্ষ্য মনে করা যাবে না। অন্যথায় সাময়িক মেহনত করে কোন রকমে পরীক্ষা দেয়া হবে। আগেও পড়া-শোনার সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং পরেও আয়ত্তকৃত পড়াগুলো ধরে রাখবার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে না। সুতরাং একজন আদর্শ ছাত্রের জন্য পরীক্ষাকে উপলক্ষ বানানো এবং সার্বক্ষণিক ও সাময়িক সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া অপরিহার্য।

পরীক্ষায় সফলতা লাভের উপায়

সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি : একজন আদর্শ ছাত্রকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে এবং শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখতে হলে যেসব বিষয়ে যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

এক. আদর্শ ছাত্রের সর্বপ্রথম কাজ হল এমন একজন তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদ ঠিক করে নেয়া, যার সাথে তার আন্তরিক মিল রয়েছে এবং যার পরামর্শ সে নির্দ্বিধায় মেনে চলতে সক্ষম। সঠিক পথে অবিচল থাকার জন্য এর কোন বিকল্প নেই।

দুই. মুতালাআ (দরসপূর্ব অধ্যয়ন), দরসে মনযোগ দিয়ে উস্তাদের তাকরীর শ্রবণ, তাকরার (দরস পরবর্তী পুনঃপাঠ) এবং সবক ইয়াদের ব্যাপারে যথাযথ ইহতিমাম করা।

তিন. নিয়মিত দরসে উপস্থিত থাকা। এর মধ্যে ভিন্ন ধরনের বরকত রয়েছে। নিয়মিত দরসে উপস্থিত থাকলে পরীক্ষার প্রস্তুতিকালীন সময়ের অভাবে অথবা ভুলে কোন একটি বিষয় ছুটে গেলে সে বিষয়টি যদি পরীক্ষায় আসে, তাহলে দরসে শিক্ষক থেকে শোনা বক্তব্যের আলোকে মোটামুটিভাবে তার উত্তর দেয়া সম্ভব হয়। অনুরূপভাবে প্রতি শুক্রবার সাপ্তাহিক পড়া আয়ত্ত করা। এক্ষেত্রে সপ্তাহের মাঝের কোন পড়া কাঁচা থাকলে সেটাও শুক্রবারে পাকা করে নেয়া।

চার. রুটিন মাফিক পড়াশোনা করা। রুটিন মাফিক পড়াশোনা করলে পড়ালেখায় বরকত হয়; সময়ের হেফাযত হয়। বাজে কাজ, বাজে কথা থেকে বেঁচে থাকা যায়। সর্বোপরি জীবন একটি শৃঙ্খলার মধ্যে চলে আসে। যা ভবিষ্যত উজ্জ্বল হওয়ার লক্ষণ। তবে রুটিন অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী হতে হবে।

পাঁচ. কোন পড়া বুঝে না আসলে অনতিবিলম্বে তা কোন সাথী অথবা উস্তাদের নিকট থেকে বুঝে নেয়া। অন্যথায় পরীক্ষার প্রস্তুতিকালীন এ নিয়ে অনেক সময় নষ্ট হবে।

ছয়. নিজের কাছে সর্বদা একটি নোটবুক রাখা। যাতে কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে লিখে রাখবে। বিশেষ করে পরিভাষার সংজ্ঞা, নুসূস ও প্রমাণাদি। এক্ষেত্রে কিতাবের সংখ্যা অনুযায়ী নোটবুক ভাগ করে নেয়াই শ্রেয়। এতে পরবর্তীতে খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। নোট করার পর সময় সুযোগে মাঝে মধ্যে তাতে নজর বুলাবে।

সাত. আরবী, বাংলা, উর্দূ তিনও ভাষায় হাতের লেখা মশক করা এবং আগে থেকেই এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। সর্বাধিক নম্বর পেতে হলে সুন্দর হস্তাক্ষরের বিকল্প নেই। তাছাড়া হাতের লেখার জন্য ৩/৪ নম্বর নির্ধারিত থাকলেও কোন পরীক্ষকই সম্ভবত এ চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেন না।

আট. প্রত্যেক বিষয়ের পর্যাপ্ত পরিমাণ পুরনো প্রশ্ন সংগ্রহ করে নিয়মিত তার উত্তর অনুশীলন করা। অর্থাৎ কোন একটি প্রশ্ন নির্বাচন করে কিতাব সামনে রেখে তার উত্তর কী হতে পারে তা সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা। এরপর ভাল ছাত্র বা কোন শিক্ষককে দেখিয়ে ভুল-ভ্রান্তিগুলো সংশোধন করা। এক্ষেত্রে যেসব বিষয় কঠিন বা কিতাবে যেগুলোর উত্তর অগোছালো-এলোমেলো দেয়া আছে সেসব প্রশ্নের উত্তর লেখাকে প্রাধান্য দেয়া। কারণ একাজ এখন না করা হলে পরীক্ষাকালীন বহু সময় নষ্ট হবে।

নয়. কাফিয়া থেকে উপরের জামা'আতের ছাত্রদের আগে থেকেই আরবীতে উত্তর লেখার অনুশীলন করা। এক্ষেত্রে সহজ বিষয়গুলো আগে লেখা। যেন অন্তরে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, 'আমি পারি'।

মনে রাখতে হবে, ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আরবীতে উত্তর দেয়ার অনেক ভূমিকা থাকে। কারণ একজন ছাত্র যখন আরবীতে উত্তর লেখে তখন খাতা খোলার সাথে সাথেই পরীক্ষকের দৃষ্টিতে সে একজন ভালো ছাত্র বিবেচিত হয়। তখন নম্বরও তিনি ভালো ছাত্র হিসেবে বেশী বেশী দিয়ে থাকেন। আরবী কিতাবের হাশিয়া ও বাইনাস সতরাইনে সংক্ষিপ্ত কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ থাকে। নিয়মিত সেগুলো মুতালা'আ করলে বোঝার যোগ্যতা অর্জনের সাথে সাথে শরাহ-শুরুহাতের দীর্ঘ ব্যাখ্যায় সময় নষ্ট করতে হয় না।

দশ. বছরের শেষ দরসগুলো এমনভাবে আয়ত্ত করা যে, সময়ের অভাবে যদি ঐ

পড়াগুলো প্রস্তুতিকালীন সময়ে নাও পড়া যায়, তাহলে অন্তত পরীক্ষায় আসলে যেন আগের পড়ার উপর নির্ভর করে উত্তর দেয়া সম্ভব হয়।

সাময়িক প্রস্তুতি : সার্বক্ষণিক মেহনতের সাথে সাথে পরীক্ষা উপলক্ষে বিশেষভাবে মেহনত করতে হবে। পরীক্ষা উপলক্ষে বিশেষ মেহনতের দু'টি স্তর।

১. খেয়ারের (পরীক্ষার প্রস্তুতিকালীন দরস বিরতী) সময়ের মেহনত।

২. পরীক্ষা চলাকালীন মেহনত।

খেয়ারের সময়ের মেহনত

(১) একজন আদর্শ, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ছাত্র কখনোই খেয়ারের অপেক্ষায় থাকে না; বরং বহুদিন পূর্ব থেকেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে দেয়। সুতরাং সেমাহী পরীক্ষার প্রস্তুতি, কুরবানীর পর থেকে; শশমাহীর প্রস্তুতি রবিউল আউয়াল থেকে এবং বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি শশমাহীর পর থেকেই নেয়া উচিৎ।

(২) খেয়ারের পূর্বে সহজ ও তাকরারের উপযোগী কিতাবগুলো পড়া। যেহেতু তখন মস্তিষ্ক এলোমেলো থাকে, তাই এগুলো সে সময়ের জন্যই উপযোগী।

(৩) খেয়ার শুরু হওয়ার ২/১ দিন পূর্বেই বোর্ড বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পরীক্ষার রুটিনকে সামনে রেখে নির্ধারিত তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী এবং কিতাবের দাবী অনুযায়ী একটি রুটিন তৈরি করবে। যাতে কোন কিতাব কতদিন এবং কোন কোন দিন পড়বে, তা নির্ধারিত থাকবে। রুটিন দু'ভাবে করা যায়।

ক. কিতাবের সংখ্যা অনুযায়ী প্রতি দিনের সময়কে ভাগ করা। এতে প্রতি দিনই সব কিতাব পড়া হবে।

খ. খেয়ারের পুরো সময়কে কিতাবের সংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করা। এতে এক কিতাব শেষ করে অন্য কিতাব পড়া হবে। এক্ষেত্রে বড় বা গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের জন্য কিছু সময় বেশী রাখা।

যার যে পদ্ধতি ভালো লাগে, সে তা-ই গ্রহণ করবে। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বরকত বেশী হয় এবং কিতাব শেষ করার তাড়নায় পড়া লেখায় এক ধরনের ঝোঁক সৃষ্টি হয় যা একাগ্রতার জন্য বড় সহায়ক। যে পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক পরীক্ষা শুরু হওয়ার একদিন আগে যেন সব কিতাব শেষ হয়ে যায়, সে দিকটায় খুব খেয়াল রাখবে।

(৪) সবগুলো কিতাবকে সমান গুরুত্ব দিয়ে যথার্থ মেহনত করা। কারণ নম্বরের দিক দিয়ে তো সব কিতাব সমান। সুতরাং কোন কিতাবকে হালকা মনে করা যাবে না।

(৫) কোন কিতাব শুরু করার আগে পৃষ্ঠা উল্টে উল্টে পুরো কিতাবের বিষয় সম্পর্কে ধারণা নেয়া। অনুরূপভাবে কোন বিষয় বা আলোচনা শুরু করার আগে দ্রুত চোখ বুলিয়ে সে সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নেয়া। এ পদ্ধতি কোন বিষয় আয়ত্ত করার জন্য বড় উপকারী।

(৬) কোন বিষয় পড়ার সময় প্রথমে শিরোনাম বা উপ-শিরোনাম পাঠ করবে। এরপর এ বিষয়ে অতীতে যত কিতাব পড়া হয়েছে, সেগুলো থেকে অতীত মা'লুমাত যেহেনে নিয়ে আসবে। এরপর আলোচ্য কিতাবের পড়া পাঠ করবে। এতে দেখবে যে, বিষয়টি এমনিতেই অনেকটা আয়ত্তে চলে এসেছে। এখন অল্প পড়লেই বাকিটা মুখস্থ হয়ে যাবে।

(৭) কোন কিতাব শুরু করার আগে সম্ভব হলে অতীতের কয়েক বছরের প্রশ্ন গভীরভাবে মুতালা'আ করবে। এরপর কিতাব শুরু করবে। এর ফলে কিতাব পড়ার সময় যেসব বিষয় বিগত দিনে পরীক্ষায় এসেছে, সেগুলোর ব্যাপারে স্বভাবতই মনোযোগ বেশী হবে। তাই মুখস্থও বেশী হবে। সুতরাং যত বেশী প্রশ্ন মুতালা'আ করা সম্ভব হবে, তত বেশী ফায়দা হবে। আর যেসব কিতাবের প্রশ্ন না পাওয়া যায়, সেগুলোতে চিন্তা-ভাবনা করবে যে, এই অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে কী কী প্রশ্ন হতে পারে এবং তার উত্তর কী হবে। প্রশ্নের উত্তরসমূহ নিজ কিতাব থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে উস্তাদের সাহায্য নিবে। পারতপক্ষে ব্যাখ্যা গ্রন্থের সাহায্য নিবে না। ছাত্র যামানায় ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও অনুবাদ দেখা যোগ্যতা তৈরিতে প্রতিবন্ধক হয়। বরং যোগ্যতা নষ্ট করে দেয়।

(৮) মুখস্থ রাখার জন্য কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করবে।

ক. বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তীব্র তাড়না, পূর্ণ আগ্রহ এবং এই আত্মবিশ্বাসের সাথে অধ্যয়ন করবে যে, আমার এ বিষয় অবশ্যই মুখস্থ হবে।

খ. কোন বিষয় মুখস্থ করে সম্ভব হলে নিজ ভাষায় সুন্দর উপস্থাপনার সাথে খাতায় লিখে ফেলবে। একবার লেখা দশবার পড়ার সমান। আর লেখা সম্ভব না হলে অন্তত কোন সাথীকে তা শুনিয়ে দেবে এবং নিজের প্রস্তুতি পরীক্ষা করবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ তা সংরক্ষিত হয়ে যাবে।

গ. আল্লাহ প্রদত্ত সব ধরনের বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করবে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ তার বুদ্ধিমত্তার সর্বোচ্চ ১৫% ব্যবহার করতে পারে। বাকিটা সঞ্চিত থাকে।

ঘ. 'কান টানলে মাথা আসে' সিস্টেম অবলম্বন করবে। যেমন, মোঘল সম্রাটদের ধারাবাহিক নাম মুখস্থ করা প্রয়োজন, তাহলে এভাবে মুখস্থ করবে যে, বাবার (বাবর) হইল (হুমায়ূন) একবার (আকবর) জ্বর (জাহাঙ্গীর) সারিল (শাহজাহান) ঔষধে (আওরঙ্গজেব)। অনুরূপভাবে মি'রাজে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন আসমানে কার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, বিষয়টি মুখস্থ করতে হবে, তাহলে এটা মুখস্থ করবে أعياهم إبراهيم অনুরূপভাবে তাশরীহ (ব্যাখ্যা) মনে রাখার জন্য মতন এবং فوائد قيود মনে রাখার জন্য تعريف মুখস্থ করে নিবে। ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ।

(৯) পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গাইডের আশ্রয় নেয়া ঠিক নয়। এতে কমপক্ষে দু'টি ক্ষতি হয়। (ক) এখান থেকে পড়লে কিতাবের মতন মনে থাকে না; ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অনুরূপভাবে বরকতও পাওয়া যায় না। (খ) এর দ্বারা ইজতেহাদী (সৃজনশীল) মনোভাবের পরিবর্তে তাকলীদী (দেখাদেখি কাজ করার)

মনোভাব তৈরি হয়, যা নিজের সু প্ত প্রতিভাকে বলি দেয়ারই নামান্তর।

(১০) সর্বদা আবু ল হাল থাকবে; ইবনু ল হাল হবে না। অর্থাৎ পরিবেশ, পরিস্থিতি, হালত ইত্যাদিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবে। কখনো হালতের অনু গত হবে না বা পরিবেশ পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হবে না। অনেক সময় খেয়ারের মু হূ র্তে মাদরাসার বিভিন্ন প্রোগ্রাম, মাহফিল বা অনু ষ্ঠান থাকে। তো এগুলোর নাম শুনেই প্রভাবিত হওয়া যাবে না। লেখাপড়ায় কোন ঘাটতি আসতে দেয়া যাবে না। খেদমতের প্রয়োজন দেখা দিলে তা গনীমত মনে করে সানন্দে আঞ্জাম দিবে এবং নির্ধারিত সময়েই তা শেষ করবে। মনে রাখবে নিষ্ঠার সাথে মাদরাসার বা উস্তাদের খেদমত করলে কোন দিন ফলাফল খারাপ হয় না; বরং দু 'টি কারণে ফলাফল আরো ভালো হয়। (ক) ওযরবশত তখন মেহনত কম হওয়ায় আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কু ল বৃ দ্ধি পায়। (খ) দীনের সাহায্য করায় তার সাথে খোদায়ী নু সরত থাকে।

পরীক্ষা চলাকালীন মেহনত

(১) খেয়ারের সময়ের পড়াশোনা শেষ করে সামান্য বিশ্রাম নিবে। তারপর পরীক্ষার আগের দিন থেকে নতু ন উদ্যমে নতু ন তৎপরতায় পড়াশোনা শুরু করবে। যে কিতাব যেদিন পরীক্ষা, সে কিতাব সেদিন শেষ করে ঘু মাবে। পরের দিন ভোরে উঠে পু রো কিতাব আবার দ্রুত নযর বু লাবে। এতে বিষয়গুলো যেহেনে উপস্থিত থাকবে।

(২) পরীক্ষা চলা অবস্থায় একা একা পড়বে। কয়েকজন মিলে পড়বে না বা তাকরার করবে না। এতে আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির কারণে সময় নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি মস্তিষ্কও এলোমেলো হয়ে যায়। একাগ্রতা বিনষ্ট হয়।

(৩) পরীক্ষার আগের দিনই প্রয়োজনীয় সব আসবাব যেমন, কলম, বোর্ড ইত্যাদি প্রস্তুত করে রাখবে। অন্যথায় পরীক্ষার সময় পেরেশানীর শিকার হতে হবে।

(৪) পরীক্ষার সময় অবশ্যই দাঁ ত পরিষ্কার করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেবে। অন্যথায় প্রশ্ন বোঝার জন্য হলের দায়িত্বশীলকে জিজ্ঞেস করলে মু খ থেকে দু র্গন্ধ ছড়াতে থাকবে। এতে তার কষ্ট হতে থাকবে। অবহেলা ও তাড়াহুড়ার কারণে সেদিন অনেকেই দাঁ ত পরিষ্কার করে না।

(৫) পরীক্ষার আধা ঘন্টা আগে পড়াশোনা বন্ধ করে দিবে। এ মু হূ র্তে কোন জটিল বিষয় নিয়ে কারো সাথে কোন আলোচনা করবে না বা কিতাবের পৃ ষ্ঠাও উল্টাবে না। এতে গোলমাল ও বিশৃ ঙ্খলা সৃ ষ্টি হয়।

(৬) পরীক্ষার পূ র্ব মু হূ র্তে এমন সাথীদের সাথে কথা বলবে না, যাদের প্রস্তুতি খারাব বা যারা আতংকিত। কারণ এর দ্বারা আতঙ্ক সংক্রমিত হতে থাকবে।

(৭) পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১০মি. পূ র্বে নাস্তা-ইস্তিঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে দু ই রাকাআত সালাতু ল হাজত পড়বে। অতঃপর ধীরে-সু স্থে এবং পূ র্ণ প্রশান্তির সাথে হলে প্রবেশ করবে। একদম কাটায় কাটায় সময় হিসাব করে হলে যাবে না, যার ফলে তাড়াহুড়া করতে হয়। কারণ এর দ্বারা মস্তিষ্কে চাপ পড়ে। ফলে হলের সকল কার্যক্রমে বিশৃ ঙ্খলা সৃ ষ্টি হয়।

পরীক্ষার হলে করণীয়

(১) হলে প্রবেশ করে প্রথমে নির্ধারিত আসন গ্রহণ করবে। তারপর খাতাপত্র পাওয়ার পূ র্ব পর্যন্ত দু রূদ শরীফ পড়তে থাকবে।

(২) খাতা হাতে আসার পর সাথে সাথে প্রথম পৃ ষ্ঠার শূ ন্যস্থান পূ রণ করবে। রোল নং অংকে/কথায় এবং জামা'আত/ মারহালা লিখতে কখনো ভু ল করবে না এবং অস্পষ্টতাও রাখবে না।

(৩) প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে সাথে সাথে পড়া শুরু করবে না; বরং প্রথমে ১১বার দু রূদ শরীফ পড়বে। তারপর আল্লাহ অভিমু খী হয়ে প্রশ্নপত্র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পু রোটা গভীরভাবে পাঠ করবে। কোন প্রশ্নে কী চাওয়া হয়েছে নিজে নিজে বু ঝে নিবে। নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকলে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করবে সেগুলোকে চিহ্নিত করে নিবে। কোন প্রশ্ন লাযিম আছে কি না তাও দেখে নিবে।

(৪) প্রশ্নপত্রের যে যে শব্দ বা অংশ বু ঝে আসেনি সেগুলোকে চিহ্নিত করবে। এরপর নেগরান থেকে বু ঝে নেয়ার অনু মতি থাকলে একসাথে সবগুলো বু ঝে নিবে। অন্যথায় দু রূদ শরীফ পড়তে থাকবে।

উত্তর লেখার নিয়ম

(১) প্রথমে যে ক'টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, মনে মনে প্রত্যেকটির সময় ভাগ করে নিবে। প্রতিটি উত্তর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করবে। এমন যেন না হয় যে, একটি প্রশ্নের উত্তরে দু ই ঘন্টা সময় লাগালে। আর দু 'টির জন্য এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা। কারণ একটি প্রশ্ন যতই ভাল করে লেখা হোক ৩১/৩২ থেকে বেশী নম্বর পাওয়া যাবে না। অথচ বাকি দু 'টিতে ৬২/৬৪ নম্বর বরাদ্ধ আছে।

(২) লেখা শুরু হবে সহজ এবং ভালভাবে জানা উত্তরটি দিয়ে। এমন যাতে না হয়, কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সহজটি হারিয়ে বসেছ। প্রবাদ আছে, عصفور فى اليد خير من عشرة فى الشجرة 'আয়ত্তাধীন একটি চড়ুই গাছের ডালে দশটির চেয়ে উত্তম'।

(৩) উত্তরে শিরোনাম (যেমন, ১নং প্রশ্নের উত্তর) লিখবে ঠিক মাঝে আর উপ-শিরোনাম (যেমন, الف، باء/ ক, খ) লিখবে আরবী বা উর্দূ তে হলে ডান দিকে আর বাংলায় হলে বাম দিকে এবং এটাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করবে। যেন পরীক্ষকের দৃ ষ্টি এটা দেখার ব্যাপারে ভু ল না করে। অতঃপর উপ-শিরোনামকে নীচের লাইনে ছোট শিরোনাম বানিয়ে মূ ল উত্তর লেখা শুরু করবে। হাতের লেখা খু ব বড় বড় বা ফাঁ কা ফাঁ কা যেন না হয়। আবার তাবিজের মত খু ব ছোট অক্ষরে যেন না হয়; বরং মধ্যম ও স্পষ্ট অক্ষরে লিখবে।

(৪) হাতের লেখা সু ন্দর ঝরঝরে এবং উপস্থাপনা চমৎকার হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে।

(৫) পরীক্ষা একটি আমানত। এ বিষয়টি সব সময় মনে রাখবে। সু তরাং খেয়ানতের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে না। কেননা খেয়ানত করে কোন দিন সফল হওয়া যায় না। মু হিউস

সুন্নাহ শাহ আবরারুল হক রহ. বলেন, যদি কোন ছাত্র আমানতদারীর সাথে পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে তবুও সে জান্নাতের রাস্তায় আছে। পক্ষান্তরে যদি কেউ খেয়ানতের সাথে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থানও অধিকার করে তবুও সে জাহান্নামের রাস্তায় আছে।

(৬) পরীক্ষার হলে কোন কিছু মনে না আসলে বেশী বেশী দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। অস্থির লাগলে কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস নিবে। এটা খুব ফলপ্রসূ আমল।

(৭) উত্তর লেখার ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের মধ্যে যে কয়টি অংশ থাকে কোনটি যেন বাদ না পড়ে; বরং প্রত্যেকটি লিখবে এবং একসাথে লিখবে। এক প্রশ্নের অংশ বিশেষকে অন্য প্রশ্নের সাথে মেশাবে না। তাছাড়া একটি বিষয়ের পরীক্ষায় কয়েক ভাষার সমাহার ঘটাবে না। সকল প্রশ্নের জবাব এক ভাষায় দিবে। অবশ্য অনুবাদ চাইলে ভিন্ন কথা। মূল ও অনুবাদ যেন একই ভাষায় না হয় সে বিষয়ে খুব খেয়াল রাখবে। যেমন, আরবী ইবারতের তরজমা যেন আরবীতে না হয়। অন্যথায় সর্বনাশ হয়ে যাবে।

(৮) উত্তর লেখার ক্ষেত্রে এত তাড়াহুড়া করবে না যে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই শেষ হয়ে যায়। আবার এত ধীর গতিতে লিখবে না যে, সময় শেষ হওয়ার পরও লেখা শেষ হয় না; বরং কমপক্ষে ১৫মি. পূর্বে লেখা শেষ করে ফেলবে এবং অবশ্যই লিখিত বিষয় পুনর্বার দেখবে এবং ঠাণ্ডা মাথায় দেখবে। অন্যথায় সঠিকটাকে ভুল বানিয়ে ফেলবে। মনে রাখবে, তুমি যেকোন লেখাই লেখ না কেন, কখনো সে লেখাটা দ্বিতীয় বার না দেখে অন্যের হাতে দিবে না। এটা জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নিবে। তাহলে অনেক ভুল থেকে বেঁচে যাবে। কারণ লেখায় ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। আর এ ভুলের জন্য অনেক খেসারত দিতে হয়।

(৯) দ্বিতীয় বার দেখা শেষ হলে সম্ভব হলে তৃতীয় বার দেখবে। অন্যথায় নির্ধারিত সময়ে খাতা জমা দিয়ে দস্তখতের খাতায় অবশ্যই দস্তখত করবে। তা না হলে তোমার পরীক্ষা দেয়ার কোন প্রমাণ থাকবে না। মোটকথা, অধিক নম্বর পাওয়ার জন্য তোমার কাছে যত কলা-কৌশল আছে সবগুলোকে প্রয়োগ করবে।

(১০) খাতা জমা দেয়ার সময় মনে করবে যে, আমার যতটুকু করার ছিল আমি করলাম। বাকিটা আল্লাহ তা'আলার হাওলায়। السعي مني والإتمام من الله 'চেষ্টা করা আমার কাজ পূর্ণতা দান করা আল্লাহর কাজ'।

পরীক্ষা-পরবর্তী কাজ

(১) পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কোন বেহুদা কাজে সময় নষ্ট না করে সময় থাকলে ঘুমিয়ে নিবে। এতে শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠে এবং সামনের পরীক্ষার জন্য নতুন উদ্যম সৃষ্টি করে।

(২) পরীক্ষা দেয়ার পর পরই কক্ষে এসে কিতাবের সাথে মিলিয়ে দেখবে না। কিংবা অন্যের সাথে আলোচনা করবে না। কারণ যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে মন খারাপ হবে এবং পরবর্তী পরীক্ষায় এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। হ্যাঁ, সব পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে প্রশ্নগুলো নিয়ে কিতাবের সাথে মিলাবে। এতে ভুল সংশোধনের পথ খুলবে।

(৩) নিজের জন্য এবং সাথীদের জন্য বেশী বেশী দু'আ করবে। শুধু নিজের জন্য দু'আ করবে না। কারণ অন্যের জন্য দু'আ করলে তখন ফেরেশতারা তোমার জন্য দু'আ করবে। ফলে আল্লাহ তা'আলার কাছে তা অতি তাড়াতাড়ি কবুল হবে।

পরীক্ষায় সফলতা লাভের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আমল

(১) আচার-ব্যবহার, আমল-আখলাক সুন্দর কর এবং নিজেকে মানুষের সামনে নম্র-ভদ্র হিসেবে পেশ কর। যেন মানুষ বিশেষ করে আসাতেযায়ে কেরামের অন্তর থেকে তোমার জন্য দু'আ আসতে থাকে।

(২) প্রত্যেক নামাযের পর يَانَاصِر (ইয়া না-সিরু) ২১ বার পাঠ করবে। ভাল ফলাফলের জন্য এই আমল অত্যন্ত ফলপ্রসূ। (মাজালিসে আবরার- ৪৬৭)

(৩) নযরের হেফাযত করবে এবং সব ধরনের তা'আল্লুক এর রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। কারণ তা'আল্লুক তথা বন্ধুত্বের রোগ থাকলে ছাত্র যতই ভালো হোক এবং যতই মেহনত করুক সফল্য অর্জিত হবে না।

(৪) অনেকে পরীক্ষার আগে বা পরীক্ষা চলাকালীন গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে। ফলে অসুস্থ হয়ে বাড়ী চলে যেতে হয়। পরীক্ষা হতে মাহরূম হতে হয়। একজন সফল পরীক্ষার্থী সে, যে সাধ্য অনুযায়ী মেহনত করে সব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারল। এজন্য খেয়ারের দিনগুলোতে রাত ১০.৩০ টায় ঘুমিয়ে যাবে। আর পরীক্ষার সময় ১১.০০ টা উর্ধ্বে ১২.০০ টা পর্যন্ত পড়বে। (অবশ্য সেটাও যার সামর্থ্য আছে তার জন্য) **(৪১ নং পৃষ্ঠায়)**

....

বলবীর সিং ... (৪৮ পৃষ্ঠার পর)

২১ এপ্রিল বাদ আসর রাহমানিয়া ছাত্র মিলনায়তনে জামি'আর উস্তাদ-ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বয়ান করেন। দীর্ঘ একঘন্টার বয়ানে তিনি মানবজাতির সমস্যা ও এর সমাধানে মুসলিম উম্মাহর করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা হলেন 'রাব্বুল আলামীন'; বিশ্বজগতের রব অর্থাৎ আলমী খোদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন 'রহমাতুল্লিল আলামীন'; বিশ্বের তরে রহমত অর্থাৎ আলমী নবী। আর কুরআনে কারীম হল 'বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন কিতাব'। কিন্তু মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এ ভুলের মধ্যে রয়েছে যে, আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও ইসলাম শুধুই মুসলমানদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও নির্ধারিত বিষয়। অথচ বিষয়টি এমন নয়। ইসলাম তো প্রতিটি মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। ফলে না মুসলমান অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠিকে ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট করার কথা ভাবছে; আর না অমুসলিমরা ইসলামকে আপন সম্পদ ভেবে বুকে তুলে নিচ্ছে। প্রত্যেক জাতিকে তাদের স্বভাবধর্ম ইসলামে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ইসলামের ধারক মুসলমানদের। তিনি আরও বলেন, ইসলাম গ্রহণের জন্য আজ অমুসলিমরা প্রস্তুত। কিন্তু মুসলমানদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ এ পথে সবচেয়ে বড় বাধা। বস্তুতঃ মুসলমানদের কার্যকলাপ অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ কঠিন করে দিয়েছে। আর অমুসলিমদের হিংসা-বিদ্বেষ তাদের মুসলমান

হওয়ার পথকে সহজ করে দিয়েছে। এর প্রমাণ আমি নিজেই। বাবরী মসজিদ ধ্বংস না হলে আমি হয়তো ইসলাম গ্রহণ করতাম না। কারণ এর পূ র্বে মু সলমানদের কার্যকলাপ দেখেই আমি সে ঘৃ ণ্য কাজে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তিনি আরও বলেন, অনেকের ধারণা, শুধু আখলাক-চরিত্র দ্বারাই অমু সলিমরা ইসলামে দাখেল হবে; তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজন নেই। বিষয়টি এমন নয়। তাই যদি হবে, তাহলে নবীজীর চেয়ে উত্তম আখলাকওয়ালা আর কে আছেন? তিনিও কিন্তু শুধু আখলাক প্রদর্শনকে যথেষ্ট মনে করেননি। বরং অমু সলিমদের দাওয়াত দিতে গিয়ে নিজের জান মাল সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়েছেন। আমরা সামাজিক প্রয়োজনে প্রতিদিন কতো অমু সলিমের সঙ্গে চলাফেরা করি, কিন্তু কখনও কি তাদের কাছে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মু ক্তির ব্যবস্থাপত্র দীন-ইসলাম পেশ করেছি? তো এর জন্য তারা যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে মামলা দায়ের করে তাহলে পরিত্রাণের উপায় আছে কি? সর্বশেষ বলেন, এই প্রতিষ্ঠানের নাম জামি'আ রাহমানিয়া। ভারতেও দারুল উলূ ম রাহমানিয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। কোনও অমু সলিম ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে নির্দ্বিধায় সে দারুল উলূ ম রাহমানিয়ায় চলে যেতে পারে যে, সেখানকার লোকজন তাকে মু সলমান বানাতে কোনও দ্বিধা-সংকোচ করবে না। আমার আবদার, এই রাহমানিয়াও ঐ রাহমানিয়ার মতো হয়ে যাক যে, সারা বাংলাদেশ থেকে যে কোনও অমু সলিম ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নিঃসঙ্কোচে এখানে চলে আসতে পারে এবং তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে। আল্লাহুম্মা আমীন ॥

বেঁ চে থাকো রাবেতা!

বেশ কিছু দিন ধরে বাতাসে একটি গুঞ্জরণ ঢেউ তু লছিল। আমাদের প্রিয় জামি'আ রাহমানিয়া থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ হবে। নাম মাসিক রাবেতা। প্রতীক্ষায় রইলাম শোনা কথাটি কবে বাস্তবে রূপ নিবে। প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এক সময় ভু লেও যাই রাবেতার কথা। সেদিন বিকেলে এক সতীর্থ বলল, আজ সন্ধ্যায় 'রাবেতা' আত্মপ্রকাশ করবে। শোনে অনির্বচনীয় এক আনন্দ-পু লকে যেন লাফিয়ে উঠলাম। সন্ধ্যাটি সেদিন রাত দশটায় সমাপ্ত হল। জন্মদিবসেই রাবেতা পড়েছিল ঢাকাবাসীর অপ্রিয় অনু ষঙ্গ যানজটের কবলে। এই একটি দিনের জন্য যানজট না থাকলে কী এমন ক্ষতি হতো ঢাকা শহরের।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রাত দশটায় রাবেতা প্রবেশ করল। একজনে বহনযোগ্য মাঝারি আকৃ তির একটি বাণ্ডিলে। একেবারে দড়ি-রশি জড়িয়ে নিঃছিদ্র নিরাপত্তায়। 'চকিত দর্শন' এর সু যোগ নেই। রাবেতার হাসিখু শি প্রাণোচ্ছল দায়িত্বশীল ভাইটিকে দেখলাম, গম্ভীর একটা ভাব নিয়ে প্যাকেটটি পর্যবেক্ষণ করছেন। অনু মান করলাম বড়জোর তিন থেকে চারশ কপি হতে পারে। মনে হলো, দরজা-জানালায় ভীড় জমানো উৎসু ক ছাত্র-জনতাকে তিনি কিভাবে সামাল দেবেন তাই ভাবছেন। খু ব ইচ্ছে করছিল, বলি– ভাই সাহেব প্যাকেটটা একটু খোলেন, চোখ দু 'টোকে তৃ প্ত করি। বলি না, পাছে আবার গোস্তাখী হয়ে যায়! অবশেষে তিনিই মু খ খু ললেন... 'আগামীকাল দাওয়াতু ল হকের মাসিক ইজতিমা। আমন্ত্রিত আইম্মায়ে মাসাজিদকে হাদিয়া পেশ করতে তড়িঘড়ি মাত্র তিনশ কপির ব্যবস্থা করা গেছে। বাকিটা আগামীকাল আসবে। কাল দু পু র নাগাদ আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। সু তরাং বু ঝতেই পারছেন সকালের আগে প্যাকেট খোলা যাচ্ছে না!' শোনে আফসোস হলো, কেন যে ইমাম সাহেব হলাম না! তারপর হঠাৎ কিভাবে যেন বড় ছোটর পার্থক্যটি ঘুঁ চে গেল। আবেগঘন কণ্ঠে কিছু টা রূঢ়তা মিশিয়ে বললাম, পত্রিকা না হয় কাল দু পু রেই নেবো, তাই বলে চোখের দেখা থেকেও বঞ্চিত থাকবো?! মনের কথা মনে গিয়েই লাগে। তিনি বু ঝলেন এবং হাসিমু খে প্যাকেট খু লে বাড়িয়ে ধরলেন একগুচ্ছ 'রাবেতা'। কী এক অপার্থিব শিহরণ সারা দেহে বয়ে গেল বলে বোঝাতো পারবো না। রাবেতার সাথে দৃ ষ্টি বিনিময় হলো। মু গ্ধ বিস্ময়ে অপলক চেয়ে রইলাম। মু হূ র্তেই স্মৃ তিরা মিছিল করে ভীড় জমালো মনের পর্দায়। বয়োবৃ দ্ধ শাইখু ল হাদীস আল্লামা আজিজু ল হক রহ., তার বিশ্বস্ত ডানাদ্বয় মু ফতী মনসূ রুল হক দা.বা. ও মাওলানা হিফযু র রহমান দা.বা., দেশজোড়া রাহমানিয়ার খ্যাতি ও রাহমানী পয়গাম। কতো কান্না-হাসির, সু খ-দু ঃখের, বিরহ ও ভালোবাসার স্মৃ তি। মনে হল, দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর রাবেতার মোড়কে যেন রাহমানী পয়গামই ফিরে এসেছে আমার হাতে। সম্বিৎ ফিরে পেলাম রাবেতার দায়িত্বশীলের অনু যোগে... আগামীকাল দাওয়াতু ল হকের মাহফিল, সকালে অনেক ব্যস্ততা, অনেক কাজ। অগত্যা রাবেতার সঙ্গে 'মোলাকাত' করেই বিদায় নিতে হল সেদিনের মত। আল্লাহর রহমতে বেঁ চে থাকো রাবেতা; আর কোন ঝড়-ঝাপ্টা তোমায় পোহাতে না হয়।

ইবনে মু স্তাফিয, কাজীপু র, সিরাজগঞ্জ

স্বপ্নের রাবেতা

সব মানু ষেরই কোন না কোন স্বপ্ন থাকে, স্বপ্ন দেখেই মানু ষ বেঁ চে থাকে। আমারও দিলে ছিল বহুদিনের লালিত এক স্বপ্ন। দোদু ল্যমান অবস্থায় ছিলাম, শুধু ই কি স্বপ্নের পেখম মেলে আকাশে উড়বো, না এর বাস্তবায়নও হবে?

কিন্তু যার ইশারায় সবকিছু হয় তিনি যে এত সহজে এত দ্রুত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দান করবেন তা ভাবিনি! তাই সমস্ত শুকরিয়া শুধু মাত্র তাঁ রই জন্য। তাঁ র দরবারে করজোড়ে মিনতি, আমার এ স্বপ্ন যেন হারিয়ে না যায়। স্বপ্নের 'রাবেতা' যেন ত্রৈমাসিক হতে ক্রমে মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিকে রূপ লাভ করে। আল্লাহ আমাদের নেক স্বপ্নগুলোকে পূ রণ করুন। আমীন ॥

মু হাম্মদ মাসউদ, ঈশ্বরদী, পাবনা

মাসিক রাবেতা

বহু প্রতীক্ষার পর আমাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া'র সন্তানদের আন্তরিকতা ও প্রচেষ্টায় প্রকাশ পেয়েছে রাবেতা। (যখন 'রাবেতা' শব্দটি লিখছিলাম তখন মন ও কলমের উপর চাপ সৃ ষ্টি করে শব্দটি লিখতে হলো। এ পর্যন্ত পেঁ ছার পর দিল ও কলম একসাথে আবেদন করে উঠলো 'মাসিক রাবেতা' লিখতে। আল্লাহ তা'আলা কবু ল করুন)। অনেক কল্পনা-জল্পনা, আগ্রহ ও উদ্দীপনার পর যখন রাবেতা হাতে পেলাম মনে হলো যেন আকাশের চাঁ দ। প্রতিটি লেখা দিলকে নূ রানী করেছে, দূ র করেছে মনের অন্ধকার। বিশেষ করে সম্পাদক সাহেবের 'বাতিল প্রতিরোধ' লেখাটি আমাদের জন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে চিরকাল। আমরা সম্পাদক সাহেবের দীর্ঘায়ু কামনা করছি। পাঠকের পক্ষ হতে সম্পাদক সাহেবের নিকট আবেদন, 'ফাতাওয়া-মাসাইল' বিভাগটিতে প্রশ্নকারীর নাম ঠিকানাসহ উত্তর লেখা এবং পাঠকদেরকে এ বিভাগের বরাবর ফাতাওয়া চাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী করার লক্ষ্যে বিভাগটির শেষে বিজ্ঞপ্তি থাকতে পারে।

মু হাম্মদ ইবরাহীম, কু মিল্লা

বহুদূ র থেকে...

রাবেতা প্রকাশের সংবাদ পেয়ে...

যে কোন মূ ল্যে রাহমানিয়ার গর্ব(?) দেওবন্দের সৌভাগ্যবান তালিবে ইল্‌মদের জন্যও কিছু রাবেতা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হউক। যদি এই সু দূ র দেওবন্দে বসিয়া রাহমানিয়ার গর্বগণ আপন হস্তে রাবেতার বদন কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিতে পারে তাহলে তারা আবেগে কাঁ দিয়া ফেলিবে। খু শিতে লম্ফঝম্ফ করিতে চাহিবে। কিন্তু মানু ষ পাগল জ্ঞান করিবে ভাবিয়া আর করিবে না।

সর্বোপরি যদি রাবেতা প্রেরণ করা হয়, তাহলে এই গর্বদের ছাতি চিরিয়া, অন্তর ফুঁ ড়িয়া রাবেতার জন্য প্রচণ্ড বেগে আশীর্বাদ ছু টিবার একটা হেতু মিলিয়া যাইবে।

অতঃপর...

রাবেতার একটা পত্রিকা বের হলো। অথচ দেওবন্দের এতগুলো সদস্যের জন্য একটা কপিও পাঠানো গেল না! মাঝখানে উস্তাযে মু হতারাম মু ফতী মীযানু র রহমান কাসেমী সাহেবও দেওবন্দ এসেছিলেন। আমার কিচ্ছু বু ঝে আসছে না। প্রবাসী সদস্যদের সঙ্গে যদি এইটু কু ন 'রব্‌ত' রক্ষা না করা যায় তাহলে

সংগঠনের নাম ‘ফারেকা’ দেওয়াই বেশী উত্তম, নয় কি?

আবু তোরাব মাসু ম, দেওবন্দ, ভারত

টাঙ্গাইল সফরে রাবেতা নেতৃবৃন্দ

মওলানা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

রাবেতা সংবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আয়োজিত 'সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' শীর্ষক সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রাবেতার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ টাঙ্গাইল সফর করেন। সফরের আহ্বায়ক ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়-মসজিদের সম্মানিত খতীব, রাবেতা-সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহ। সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন রাবেতার মজলিসে শূরার মুহতারাম আমীর মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল মাসউদ দা.বা.। সেমিনার শেষে উলামায়ে কেরামের সঙ্গে সৌজন্য-সাক্ষাত, মাদরাসা পরিদর্শন ও রাবেতার পরিচয় ও কার্যক্রম তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কাফেলাটি টাঙ্গাইল জেলার শীর্ষস্থানীয় মাদরাসাগুলোয় ঝটিকা সফর করে। এ সফরে দারুস সুন্নাহ গোরস্থান মাদরাসা, জামি'আ ইসলামিয়া আশরাফুল উলূম দুলের চর, জামি'আ মাহমূদিয়া আরাবিয়া মাদীনাতুল উলূম বাজিতপুর, জামি'আ ইসলামিয়া বোয়ালীসহ বেশ ক'টি মাদরাসার মুহতামিম ও দায়িত্বশীল আসাতিযায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাত ও মতবিনিময় করা হয়। রাবেতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের বিবরণ শোনে এসব উলামায়ে কেরাম অত্যন্ত খুশি প্রকাশ করেন ও দু'আ দেন। এ সময় তাদের মধ্যে রাবেতার মুখপত্র 'ত্রৈমাসিক রাবেতা' বিতরণ করা হয়। বরকতময় এ সফরে আমীরে শূরার সঙ্গী ছিলেন, রাবেতার কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা শফীকুর রহমান, সহ-প্রচার সম্পাদক মাওলানা শফীক সালমান, ও মাওলানা সুহাইলসহ রাবেতার টাঙ্গাইল জেলার নেতৃবৃন্দ।

ত্রৈমাসিক রাবেতা প্রকাশিত

জানুয়ারী '১৪ খ্রিস্টাব্দে পরীক্ষামূলকভাবে রাবেতার মুখপত্র 'ত্রৈমাসিক রাবেতা'র প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। ব্যাপক আগ্রহ ও চাহিদা থাকায় কয়েকদিনের মধ্যেই প্রথম মুদ্রণ শেষ হয়ে যায়। তারপর জরুরী ভিত্তিতে দ্বিতীয় মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়। রাবেতা-কর্তৃপক্ষ এটাকে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ ও শুভলক্ষণ মনে করছে এবং সকলের সহযোগিতা ও দু'আ কামনা করছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাবেতা দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের জোর প্রচেষ্টা চলছে। আল্লাহ তা'আলা সহায় হোন। আমীন ॥

রাহমানিয়ার হালচাল

শাইখুল জামি'আর বগুড়া সফর

গত ২৬ মার্চ জামি'আর শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. উত্তরবঙ্গ সফর করেন। বগুড়ার ঐতিহ্যবাহী দীনী প্রতিষ্ঠান জামিল মাদারাসায় উলামায়ে কেরামের এক সমাবেশ আহ্বান করা হয়েছিল। সহস্রাধিক উলামায়ে কেরামের এ নূরানী মজমায় মুহতারাম মুফতী সাহেব 'আহলে হাদীস ফিতনার স্বরূপ উদ্ঘাটনে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব-কর্তব্য' শীর্ষক তথ্যবহুল দীর্ঘ বয়ান পেশ করেন। অতঃপর মুসলিম উম্মাহ, দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে দু'আ করা হয়।

জামি'আতুল আবরার ও মসজিদুল আবরারের নির্মাণ কাজ চলছে

নানা রকম ঝামেলা ও অসুবিধা সত্ত্বেও আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়া ও মসজিদুল আবরার কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ৪০ কোটি টাকার এ প্রজেক্টে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ২০ কোটি টাকা। ১২ কাঠা জমির ওপর ৬ তলা বিশিষ্ট মসজিদুল আবরারের ৩য় ছাদ ঢালাই শেষে বর্তমানে ৪র্থ ছাদ ঢালাইয়ের আয়োজন চলছে। ইনশাআল্লাহ কয়েকদিনের মধ্যেই জামি'আতুল আবরারের ১০ তলা বিশিষ্ট শিক্ষাভবন ও ছাত্রাবাসের পাইলিংয়ের কাজ শুরু হবে। পাইল সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদিও ইতোমধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেছে।

রাহমানিয়ার দুই তৃতীয়াংশ জামি'আতুল আবরারে স্থানান্তর

মুহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে সরাসরি ভেড়িবাঁধ তিন রাস্তার মোড় পর্যন্ত সড়ক প্রশস্ত করার কাজ শুরু হওয়ায় রাহমানিয়ার ভাড়া-বাড়ির বেশিরভাগ অংশ ভাঙ্গা পড়বে। এজন্য জামি'আর একতৃতীয়াংশ তালিবুল ইলমকে জরুরী ভিত্তিতে নিজগৃহ জামি'আতুল আবরারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জামি'আ কর্তৃপক্ষ আগামী রমাযানের পূর্বেই রাহমানিয়াকে তার নিজস্ব ভূমিতে স্থানান্তরের কথা ভাবছেন।

মাস্টার মুহাম্মাদ আমের ওরফে বলবীর সিংয়ের রাহমানিয়ায় আগমন

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর ভারতের উগ্রবাদী হিন্দুরা সম্রাট বাবর-নির্মিত ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদকে শহীদ করে দেয়। নির্মম সে ধ্বংসযজ্ঞের পর গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এক ভয়াবহ দাঙ্গা। নিহত হয় হাজার হাজার মানুষ, ধ্বংস হয় সহস্রাধিক ঘর-বাড়ি। যার সিংহভাগ শিকার ছিলেন মুসলমানগণ। প্রতিবাদে ফেটে পড়ে বাংলাদেশসহ গোটাবিশ্ব। শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ. বাবরী মসজিদ পুনরুদ্ধারে ডাক দেন ঐতিহাসিক লংমার্চের। সে ডাকে সাড়া দিয়ে এদেশের উলামায়ে কেরামসহ ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ ঈমানের দাবীতে রাজপথে নেমে আসে। সে এক ট্রাজেডি, করুণ ইতিহাস।

তারপর কুদরতে ইলাহীর কারিশমা দেখুন, রামের কথিত জন্মস্থানকে মসজিদ ও মুসলমানমুক্ত করার হিংস্র নেশায় সেদিন বাবরী মসজিদের প্রধান গম্বুজে যে হাত সর্বপ্রথম কোদাল চালিয়েছিল, আজ সে হাত মসজিদ ও মুসলমানদের সেবায় সদা নিয়োজিত। যে বুক থেকে সেদিন হিংসার অনল ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারত জুড়ে, আজ সে বুক সারা দুনিয়ার বনী আদমকে স্থায়ী আগুন জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা দিতে বেচইন, উন্মুখ। চরমশত্রু থেকে পরম বন্ধুতে পরিণত হওয়া হরিয়ানা প্রদেশের এ মানুষটির নাম মাস্টার মুহাম্মাদ আমের ওরফে বলবীর সিং। বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারী হাতটি অবশেষে মসজিদের মালিকের হাতে চিরবন্দী হয়েছে। শুধু তাই নয়; ভাই আমের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন, পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবেন প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি করে নতুন মসজিদ নির্মাণ করবেন। নিদেনপক্ষে অনাবাদ মসজিদকে আবাদ করবেন।

আর রাতে ঘু মানোর আগ পর্যন্ত দৈনিক একজন করে অমু সলিমকে মু সলমান বানাবেন। এ পর্যন্ত প্রায় দশ হাজারের অধিক অমু সলিম তার হাতে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়েছে।

গত ১৯ এপ্রিল তিনি দশ দিনের এক দীনী সফরে বাংলাদেশে আগমন করেছেন। **(৪৬ নং পৃ ষ্ঠায়)**